গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ২৫ ফেব্রুয়ারি - ৩ মার্চ ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

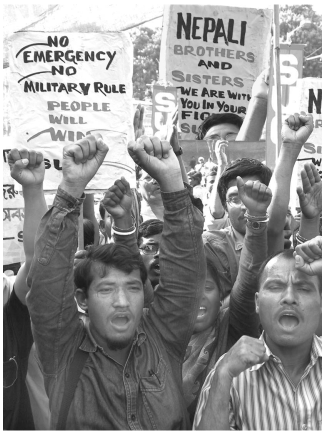

নেপালের জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার চাই

নেপালে জনগণকে মতপ্রকাশের, মিটিং-মিছিল করার ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে টেলি-যোগাযোগ সহ সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়ে, সশস্ত্র বাহিনীর নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপে, নিজ ব্যবস্থাপনায় সাজানো উৎসবের মধ্য দিয়ে নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্র রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে ১৮ ফেব্রুয়ারি সেদেশের ৫৫তম জাতীয় গণতন্ত্র দিবস পালন করেছেন — এর চেয়ে বড় প্রহসন আর কী হতে পারে!

কিন্তু এর চেয়েও বড় প্রহসন আছে। দুনিয়ার গণতন্ত্র হত্যাকারীদের পাণ্ডা, মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ জ্ঞানেন্দ্রকে বলেছেন, ১০০ দিনের মধ্যে গণতন্ত্র ফেরাতে হবে! ভারত এবং নেপাল উভয় দেশকেই যারা শোষণ-লুণ্ঠন করেছে, সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিদেশমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র নেপালের পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন!

ভারতের বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহ নেপাল নিয়ে জ্যাক স্ট্রয়ের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং ভারত সরকার রাজাকে গণতন্ত্র ফেরাতে বলেছে। ভারতের শাসকরা অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের জনগণের মতোই নেপালি জনগণের কাছেও সম্প্রসারণবাদী, আধিপত্যবাদী হিসাবেই পরিচিত ও ধিকৃত। জ্যাক স্ট্রয়ের সঙ্গে ভারত সরকারের এই বৈঠক তাদের সেই ধারণাকেই শক্তিশালী করবে।

বলাবাহুল্য, যারা নিজেরা গণতন্ত্রের আবরণে প্রতিদিন গণতন্ত্রকেই হত্যা করছে, তাদের এই বক্তব্য শ্রেণীউদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছাড়া কিছুই নয়। তাই এসব মহাগণতন্ত্রীরা স্পষ্টভাষায় একথাটা বলছে না যে, রাজার হাতে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ রদ করে নেপালের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও অধিকার নেপালি জনগণকে দিতে হবে। কাজেই এদের মুখে নেপালের গণতন্ত্র ফেরানোর কথা আসলে জনমতকে প্রতারিত করার মুখোশমাত্র।

নেপালে রাজাও যে প্রকৃত গণতন্ত্র দেবে না — রাজার পূর্বাপর কার্যকলাপ থেকে এটা বোঝা আদৌ কঠিন নয়। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি নেপালের জনগণ দফায় দফায় গণতন্ত্রের জন্য লড়ছেন। ১৯৫০ সালে রানাশাহীর অবসানের ও নির্বাচিত সরকার গঠনের দাবিতে নেপালের জনগণ রক্তক্ষয়ী ঐতিহাসিক গণসংগ্রামে ফেটে পড়ে। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে আমাদের দল নেপালের জনগণের সেই আন্দোলনকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। পরবর্তীকালে তাঁরই শিক্ষার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই নেপাল প্রসঙ্গে ভারতীয় লগ্নীপুঁজির সম্প্রসারণবাদী পদক্ষেপ ও সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষার চরিত্র উন্মোচিত করে।

নেপালের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেপালের জনগণকে পুঁজিবাদী অর্থেও ন্যূনতম গণতন্ত্র দিতে পারেনি, পুঁজিবাদী অর্থে অর্থনৈতিক সংস্কার ঘটিয়ে দেশের পশ্চাদ্‌পদতাও ঘোচাতে পারেনি। সেখানে রাজনৈতিক উপরকাঠামোয়, বিশেষত প্রশাসনিক ধাঁচার বহিরঙ্গে সামন্তী চেহারা অনেকাংশে থেকে গেলেও সর্বোচ্চ মুনাফাকে উৎপাদনের উদ্দেশ্য এবং শ্রমকে বাজারের পণ্যে পরিণত করার মধ্য দিয়ে নেপালে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুনাফাভিত্তিক শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর রাজাকে রেখে, রাজার প্রতি নেপালি জনগণের পরম্পরাগত আনুগত্যকে কাজে লাগিয়ে, কার্যত একটি স্বৈরাচারী বুর্জোয়া শাসন সেখানে চাপিয়ে রাখা হয়েছে। ৫৫ বছর একটানা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শোষণের ফলে দরিদ্র নেপালি জনগণের দারিদ্র্য চরম হয়েছে। নেপাল সরকারের ২০০৩-০৪ সালের আর্থিক সমীক্ষাতেই বলা হয়েছে, পশ্চিমের তরাই অঞ্চলের জেলাগুলিতে ৫৩ শতাংশ, মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির পাহাড়ী অঞ্চলে ৫৬ শতাংশ এবং সুদূর পশ্চিমের পাহাড় ও পার্বত্য এলাকায় ৭২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন। বর্তমান যুগে নেপালের মানুষের গড় আয়ু ষাটের নিচে। শিল্প ও কৃষিতে জীবিকার সুযোগ খুবই কম। প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগেই নেপালি তরুণরা আড়কাঠির সাহায্যে সমতলে আসত কাজের সন্ধানে, নয়ত ঢুকতো সেনাবাহিনীতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বলি হতে। জনগণের সেই বঞ্চনা আরও তীব্র হয়েছে,

(বাঁদিকে উপরে) ১৬ ফেব্রুয়ারি নেপালে স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদে কলকাতায় নেপালি কনসুলেটের সামনে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ ; (নিচে) রাজা জ্ঞানেন্দ্রর কুশপুতুলে আগুন দিচ্ছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ (সংবাদ ৭-এর পাতায়)

সাতের পাতায় দেখুন

প্রকাশ্য শুনানি না করে মাশুল বৃদ্ধি

কমিশন দপ্তরে বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভ

প্রকাশ্য শুনানি না করে বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারণ করার বিরুদ্ধে এবং ২০০৫-০৬ সালের মাশুলবৃদ্ধির জন্য সিইএসসি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের আবেদন অবিলম্বে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক বাতিল করার দাবিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকশত বিদ্যুৎ গ্রাহক সল্টলেকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সামনে বিক্ষোভ দেখান।

অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এবং বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের উপদেষ্টা-মণ্ডলীর সদস্য সঞ্জিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল কমিশনের চেয়ারম্যান এস এম ঘোষের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান প্রতিনিধি-দের বলেন, বিদ্যুৎ আইনের কোথাও প্রকাশ্যে শুনানি করতেই হবে, একথা বলা হয়নি। তিনি বলেন, বিষয়টি কমিশনে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, সুপ্রিম কোর্ট এবং ক্রেতা সুরক্ষা আইন প্রকাশ্য শুনানি করার জন্য বলেছে। বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ কমিশনকে স্বচ্ছতা রক্ষা করতে বলেছে এবং গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষা করতে বলেছে, কিন্তু কমিশন উপদেষ্টা কমিটির বক্তব্য এবং গ্রাহকদের বক্তব্য যদি না শোনে তা হলে কী করে স্বচ্ছতা রক্ষা হতে পারে! তিনি বলেন, ভারতবর্ষের সব রাজ্যে প্রকাশ্য শুনানি করেই মাশুল নির্ধারণ করা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে সেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বন্ধ করা হবে কেন?

তিনি বিক্ষোভকারীদের সামনে বলেন, 'যদি প্রকাশ্যে শুনানি না করে পুনরায় মাশুলবৃদ্ধি করা হয় তাহলে আমরা আবার হাজারে হাজারে আসবো, কমিশন অবরোধ করা হবে।' তিনি বলেন, কমিশন, লাইসেন্সি ও সরকার মিলে এক অশুভ চক্র গড়ে উঠেছে। এই চক্রকে ভাঙতে হবে। তিনি এপ্রিল মাসে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শিবাজী দে, অমল মাইতি, প্রদ্যোৎ চৌধুরী, অনুকুল ভদ্র, মণিমোহন ঘোষ প্রমুখ।

ভিতরের পাতায়

- কৃষকের সমস্যা
- তৃণমূল খুঁজছে নতুন জোটসঙ্গী
- বৃত্তি পরীক্ষা
- ত্রিপুরায় অনলাইন লটারি
- জেলায় জেলায় আন্দোলন

মেদিনীপুর

বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন চলছে

যাত্রী পরিষেবা উপেক্ষা করে বাস মালিকদের দাবিমত মেদিনীপুর জেলায় ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে বাসের ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রথম স্টেজে (৪ কিমি) ৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩.৫০ টাকা করা হয়েছে। এরপর কিলোমিটার প্রতি ৩৪ পয়সার জায়গায় করা হয়েছে ৩৬ পয়সা।

এদিকে ভাঙাচোরা রাস্তার জন্য প্রায় প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে, যাত্রীদের প্রাণ যাচ্ছে। মেদিনীপুর জেলায় মেছেদা একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন, প্রতিদিন প্রায় ২৫-৩০ হাজার মানুষ এখান দিয়ে যাতায়াত করে। অথচ রাত ৯-৩০-র পরে সেখানে যাওয়া বা আসার কোন বাস থাকে না। এই অবস্থার সুরাহার দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই-এর শান্তিপূর্ণ পথ অবরোধে পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ করেছিল। অথচ বাসমালিকদের দাবি পূরণ করে দিল মালিকদরদী সিপিএম সরকার।

এস ইউ সি আই মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা এক বিবৃতিতে বলেন, টিকিট প্রতি ১০ পয়সা বাড়ালেই যেখানে মালিকরা বাড়তি মুনাফা পাবে, সেখানে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে ৫২ পয়সা হারে। এই অন্যায়-অযৌক্তিক ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে স্টপেজে স্টপেজে যাত্রী কমিটি গড়ে তুলে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বাসযাত্রী ও জনগণের কাছে তিনি আহ্বান জানান।

ভাড়ার বৈষম্য

হাওড়া, ২৪ পরগণা, কলকাতার বাসভাড়া

দূরত্ব (কিমি)	পুরানো ভাড়া (টাকায়)	নতুন ভাড়া (টাকায়)
৪	৩.০০	৩.৫০
৮	৪.০০	৪.৫০
১২	৪.৫০	৫.০০
১৬	৫.০০	৫.৫০
২০	৫.৫০	৬.০০
২৪	৬.০০	৬.৫০

মেদিনীপুর জেলায় বাসভাড়া

দূরত্ব (কিমি)	পুরানো ভাড়া (টাকায়)	নতুন ভাড়া (টাকায়)
৪	৩.০০	৩.৫০
৮	৪.৫০	৫.০০
১২	৬.০০	৬.৫০
১৬	৭.০০	৮.০০
২০	৮.৫০	৯.৫০
২৪	১০.০০	১১.০০

ভোটের বাজারে বিজেপি'র ভাটা

তৃণমূল খুঁজছে নতুন সঙ্গী

কে না জানে বিজেপি'র জোটসঙ্গী তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু তৃণমূল নেতা পঙ্কজ ব্যানার্জী তা অস্বীকার করেছেন। কাগজে বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, 'বিজেপি'র সঙ্গে তৃণমূলের জোটবন্ধন হয়নি; আমরা এনডিএ'র অন্যান্য দলের মত একটি শরিক দলমাত্র, যারা ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল।' পঙ্কজবাবু এই চালাকিটা নিঃসন্দেহে সিপিএমের কাছ থেকেই শিখেছেন — যারা একইভাবে বলে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে সরকার গঠন করেনি। কিন্তু সিএমপি মেনে শাসন পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের ওপর তাদের চাপ রাখতে হবে। এধরনের 'যখন যেমন তখন তেমন' সুবিধাবাদী লাইন সিপিএমের মত তৃণমূলও নিচ্ছে, কারণ পেছনে রয়েছে ভোট। ১৯ জুন হবে কলকাতা কর্পোরেশনের ভোট। বিজেপিকে এ রাজ্যে ঢুকতে দিয়ে তৃণমূলের গায়ে সাম্প্রদায়িকতার সহযোগী হিসাবে যে ছাপ পড়েছে, সেটা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে তৃণমূলকে সমস্যায় ফেলছে — এটা আঁচ করেই তৃণমূল ধর্মনিরপেক্ষতার ভেক ধরতে এহেন হাস্যকর উক্তি করছে। কিন্তু বিজেপি নেতা রাহুল সিন্হা পঙ্কজবাবুর এই প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দিয়ে বলেছেন, আগে এ রাজ্যে তৃণমূল-বিজেপির আঁতাত হয়েছিল, তারপরে এনডিএ সরকার গঠন হয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রে এনডিএ জোট তৈরির আগেই এরাজ্যে তৃণমূল জোট বেঁধেছিল বিজেপি'র সাথে। ২০০১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় তৃণমূল হঠাৎ বিজেপি'র জোট ছেড়ে কংগ্রেসের সাথে আঁতাত করেছিল রাইটার্স দখলের আশায়। তা ফল না দেওয়ায় তৃণমূল আবার বিজেপি'র সাথে হাত মেলায়। এখন ভোটের বাজারে বিজেপি'র ভাটা চলছে। অতএব এখন বিজেপি'র নৌকা ছেড়ে অন্য নৌকা খোঁজার পালা শুরু হয়েছে তৃণমূল দলে। সত্যিই পঙ্কজবাবুদের এখন 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থা! সুবিধাবাদী বুর্জোয়া রাজনীতির এটাই নিয়ম। (তথ্যসূত্র ঃ টাইমস্ অব ইন্ডিয়া ১৬-২-০৫)

হাওড়া

পানীয় জলের দাবিতে গ্রামবাসীদের আন্দোলন

পুরনো দু'জন পাম্প অপারেটরকে সরিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির মনোনীত ব্যক্তিদের চাকরি না দেওয়ার অপরাধে পাম্প হাউসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন হাওড়ার শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। ফলস্বরূপ পাম্প হাউসের উপর নির্ভরশীল ৭টি গ্রামের প্রায় ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানীয় জল পাচ্ছেন না। এমনই অভিযোগ এলাকার মানুষের।

এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে পাম্প খোলার দাবিতে গ্রামবাসীদের নিয়ে গড়ে ওঠে 'শীতলপুর গ্রামোন্নয়ন কমিটি'। কমিটির বিক্ষোভের ফলে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চাবি তুলে দেন কমিটির সম্পাদক বিমল দলপতির হাতে। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তিনি পুনরায় চাবি তাঁর হেফাজতে নিয়ে নেন। ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্মিত গ্রামবাসীরা পুনরায় কমিটির সহ-সম্পাদক ও এলাকার বিশিষ্ট এস ইউ সি আই কর্মী প্রলয় মাইতির নেতৃত্বে ৩ ফেব্রুয়ারি সভাপতিকে ডেপুটেশন দিলে তিনি ৮ ফেব্রুয়ারি চাবি ফেরত দেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। ঐ দিন সভাপতি নিজেই অনুপস্থিত থাকেন এবং সিপিএমের দুই সক্রিয় কর্মী পাম্প হাউসের তালা ভেঙে ঢুকে পড়েন। উক্ত দুই অপরাধীর বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরি করা হয়, কিন্তু থানা কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এমতাবস্থায় সমস্যার সমাধানের দাবিতে জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষের কাছে গেলে তিনিও কোন ব্যবস্থা নিতে অসম্মত হন। গ্রামবাসীরা তাঁকে ঘেরাও করেন। তখন শ্যামপুর থানার ও সি বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে এসে বিনা প্ররোচনায় লাঠিচার্জ শুরু করেন এবং গ্রামোন্নয়ন কমিটির সহ-সম্পাদক প্রলয় মাইতিকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে লক-আপে আটক করেন। গ্রামবাসীদের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে ও হাওড়া জেলা পরিষদের বিরোধী সদস্য শ্রীধর মণ্ডলের চেষ্টায় শেষপর্যন্ত প্রলয় মাইতিকে ওসি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। পুলিশের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে পরের দিন ৯ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার মানুষ সিপিএমের এই ঘৃণ্য দলবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি নিচ্ছেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

৪০ লক্ষ টাকার মিড-ডে মিলের চাল চুরি

রায়দিঘি থানা এলাকার মথুরাপুর ২নং ব্লকে চুরি হয়ে যাওয়া ৪০ লক্ষাধিক টাকার শিশুদের মিড-ডে মিলের চাল ফেরত, থানার পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সহ ১১ দফা দাবিপত্র নিয়ে নাগরিক কমিটির ডাকে গত ১১ ফেব্রুয়ারি রায়দিঘি থানা ও মথুরাপুর ২নং ব্লক অফিসে গণঅবস্থান ও বিক্ষোভের কর্মসূচি পালিত হয়। হাজার হাজার মানুষ মিছিল সহকারে এই আন্দোলনে যোগ দেন। উল্লেখ্য, সিপিএম পরিচালিত মথুরাপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতি ঐ শিশুখাদ্যের সংরক্ষণ ও বিলিবন্টন করে। ভারপ্রাপ্ত স্থায়ী সমিতিতে বিডিও-র প্রতিনিধিও আছেন। ফলে তাঁরা কেউই এই চুরির দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না।

রায়দিঘি থানা দীর্ঘদিন ধরে নাগরিক কমিটির অভিযোগপত্র গ্রহণ করছিল না। অবশেষে এই আন্দোলনের চাপে ডায়মন্ডহারবার এসডিপিও-র নির্দেশে মন্দিরবাজার সিআই রায়দিঘি থানায় উপস্থিত থেকে দাবিপত্র গ্রহণ করেন এবং সমস্যাগুলি সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে থানার ওসি-কে নির্দেশ দেন। মিথ্যা মামলায় ধৃত ব্যক্তিকে ঐ কেস থেকে রেহাই দেবেন বলে সিআই প্রতিনিধিদের জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিডিও'র তদন্তে প্রমাণিত উক্ত চাল চুরির ঘটনার প্রতিবাদে ২০০৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দিতে গেলে সিপিএম-এর জেলা পরিষদের এক সদস্যের নেতৃত্বে দলীয় গুণ্ডাবাহিনী, পুলিশ-প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় রেখে ডেপুটেশনে অংশগ্রহণকারী মা-বোন সহ সাধারণ নাগরিকদের উপর বর্বর অত্যাচার চালায়। সেই সময় থেকেই নাগরিক কমিটি লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে আসছে। ইতিপূর্বে গণদাবীতে সে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

অবস্থানে সভাপতিত্ব করেন রত্নেশ্বর চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন আব্দুর রউফ, স্বপন শিকারি, রেণুপদ হালদার প্রমুখ। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন গোপাল সেন, ভাগ্যধর হালদার, অজিতকুমার বর, ইন্দ্রনারায়ণ সরদার, সনাতন দাস, দিলীপকুমার মণ্ডল, বিজয় হালদার প্রমুখ।

কমরেড শিলাজিৎ সান্যালের উপর আক্রমণ

এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড শিলাজিৎ সান্যালের উপর সি পি এম দুষ্কৃতীরা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে গুরুতরভাবে আহত করেছে।

কলকাতা সংলগ্ন মহেশতলা এলাকায় সি পি আই (এম)-এর উৎপীড়নে নির্যাতিত অসহায় গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে, জনগণের দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই যে আন্দোলন গড়ে তুলছে তার ফলে এলাকার কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগছে, সি পি এম-ও জমি হারাচ্ছে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সি পি এমের সঙ্গে যুক্ত, নানা অপকর্মের নাটের গুরু দীনেশ দাস ১৯ ফেব্রুয়ারি কমরেড সান্যালকে গোপনে অনুসরণ করে দুপুর ১২-২০ মিনিটের ডাউন বজবজ লোকাল ট্রেনের কামরায় তার দলবল নিয়ে কমরেড সান্যালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারতে থাকে। কমরেড সান্যালের মুখ ফেটে যায়।

দুষ্কৃতীদের গালিগালাজের কথা থেকে যাত্রীরা বুঝতে পারেন, কমরেড সান্যাল এস ইউ সি আই-এর সংগঠক। তাঁরা সক্রিয় হয়ে বাধা দেন, কমরেড সান্যালকে দুষ্কৃতীদের কবল থেকে মুক্ত করেন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় অন্য কামরায় নিয়ে যান। পরে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা করানো হয়।

দুষ্কৃতী দীনেশ দাসের বিরুদ্ধে মহেশতলা থানা ও বালিগঞ্জ জি আর পি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

বর্ধমান

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে থানায় ডেপুটেশন

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, সন্ধ্যায় বর্ধমান ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ভাণ্ডারডিহি গ্রামের সিপিআই(এম) সদস্য অজয় কোটের বাড়িতে ঝাড়খণ্ড থেকে চাষের কাজ করতে আসা এক ১৩ বছরের আদিবাসী কিশোরী তার দাদার সাথে সরস্বতী পূজার জলসা দেখে ফেরার পথে কয়েকজন দুষ্কৃতীর দ্বারা ধর্ষিতা হন।

দুষ্কৃতীরা সকলেই ঐ গ্রামের শাসকদলের কর্মী-সমর্থক বলে সংবাদে প্রকাশ। ফলে ধর্ষিতার দাদা ডায়েরি করতে গেলে প্রথমে থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরে এলাকার মানুষের চাপে তা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এখনও পর্যন্ত পুলিশ এই ব্যাপারে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি জেলার ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার্স)-এর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যজুড়ে ঘটে চলা নারী-নির্যাতনের ঘটনায় অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে স্মারকলিপিতে এই সব বিকৃতমনা নরপশুরা, যারা অধিকাংশ সময়েই শাসকদল সিপিএমের আশ্রিত, তাদের গ্রেপ্তারির ক্ষেত্রে পুলিশ-প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। সেই সাথে উপরোক্ত ঘটনায় দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, এবং ধর্ষিতা কিশোরীর সুচিকিৎসা ও সুস্থ সামাজিক নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়। তাছাড়া যেভাবে সিনেমা, ভিডিও, টেলিভিশনে যৌনতার প্রদর্শন চলছে, অশ্লীল পত্রপত্রিকা বিক্রি হচ্ছে, মদ-জুয়া-সাট্টার রমরমা কারবার চলছে, সে বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার্স) স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং বর্ধমান শহরের বিভিন্ন স্থানে মদ, জুয়া, সাট্টা বন্ধের ব্যবস্থা করার বিষয়ে উদ্যোগ নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

কৃষি নিয়ে সেমিনারে কৃষিবিজ্ঞানীদের প্রশ্ন ঃ

‘এত প্রযুক্তি নিয়ে আমাদের তাহলে লাভ কী হচ্ছে’

খড়গপুর আই আই টিতে গত ডিসেম্বরে চারদিন ধরে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হ’ল। আলোচ্য বিষয় ছিল ঃ কৃষি ও খাদ্যে আধুনিক প্রযুক্তি কীভাবে প্রয়োগ করা হবে। আমেরিকা, জার্মানি, কানাডা সহ দশটি দেশ এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। আই-আই-টি’র কৃষিবিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক চুরাশি বছর বয়স্ক মাননীয় অমরেন্দ্র পাণ্ডা প্রশ্ন তোলেন, স্বাধীনতার প্রথম চল্লিশ বছর যেখানে চাষীর পেটের দায়ে আত্মহত্যার খবর বিরল ছিল, সেখানে গত দশ বছরে সেই সংখ্যা কেন এত বাড়ল? উল্লেখ করা প্রয়োজন, এদেশে গত পাঁচ বছরেই চাষীর আত্মহত্যার সংখ্যা সরকারি মতে তিন হাজার। তাঁর অভিযোগ চাষ করার জন্য সার, বীজ সহ অন্যান্য দ্রব্যের দাম গত দশ বছরে তিনগুণ বেড়েছে। অথচ ফসলের দাম তো বাড়েইনি, বরং কমেছে। তাঁর আরও প্রশ্ন ঃ এত প্রযুক্তি নিয়ে আমাদের তাহলে কী লাভ হচ্ছে? কেন অভাবের তাড়নায় একের পর এক চাষী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন? কেন এখনও উৎপাদন এত কম? কেন এখনও উৎপাদনের জন্য এত ব্যয়? চাষ করে চাষীরাই বা এই ২০০৪ সালে এত কম টাকা কেন পাবেন? ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা দফতরের সচিব এবং ডিরেকটর জেনারেল ডক্টর মঙ্গলা রাই তাঁর বক্তব্যে প্রশ্ন তোলেন ঃ কৃষিতে উৎপাদন বাড়াতে কেন আরও বেশি মাত্রায় মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে না? তথ্য দিয়ে তিনি জানান ঃ পৃথিবীর ১৬ শতাংশের বেশি মানুষ এখন ভারতে থাকেন। আর কৃষি জমি রয়েছে মাত্র ২.৩ শতাংশ। এভাবে চললে ২০৩০ সালে চিত্রটা কী দাঁড়াবে? (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫-১২-০৪)

বিজ্ঞানসেবী ও দেশপ্রেমিক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসাবে সেমিনারে তাঁদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলির মধ্য দিয়ে যে গভীর ক্ষোভ এবং উদ্বেগ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে, প্রতিটি বিজ্ঞানসাধক ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ মানুষমাত্রেই তাতে আন্দোলিত না হয়ে পারে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির বিস্ময়কর এক পর্যায়ে এই প্রশ্ন ও সমস্যাগুলি যে বিশ্লেষণের দাবি রাখে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পুঁজিবাদী ঐতিহাসিক প্রবণতা

মার্কস পুঁজিবাদী সঞ্চয় বা পুঁজির জন্মপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন এক মর্মান্তিক বাস্তব সত্য। তিনি বলেছেন, “...টাকা যদি দুনিয়ায় আসে, অঁসিয়ের (অঁসিয়ে - বিশিষ্ট ফরাসী পণ্ডিত) মতে, এক গালে জন্মগত রক্তচিহ্ন নিয়ে, তবে পুঁজি আসে আপাদমস্তক প্রতি রোমকূপ থেকে রক্ত বা ক্লেদ চোঁয়াতে চোঁয়াতে। পুঁজিবাদ এল, উৎপাদন ও জীবনধারণের সামাজিক উপায়গুলিকে পুঁজিতে এবং অন্যপ্রান্তে ব্যাপক জনগণকে মজুরি-শ্রমিকে, আধুনিক সমাজের যা এক কৃত্রিম সৃষ্টি সেই স্বাধীন “মেহনতি গরিবে’ রূপান্তরের জন্য ...” (সূত্র ঃ পুঁজির উদ্ভব, মার্কস) পুঁজির গতিপ্রকৃতি যে আধুনিক রূপ গ্রহণ করেছে তাতে মৌলিক এই শোষণমূলক বিধ্বংসী চরিত্রটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে শুধু নয়, বরং তা আরও বীভৎসই হয়েছে। আজ পুঁজি পৌঁছেছে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে, পুঁজিবাদী বিকাশের যা সর্বোচ্চ স্তর। সাম্রাজ্যবাদী এই স্তর লগ্নী-পুঁজির স্তর হিসাবে লেনিন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এবং এই স্তরটিকে ক্ষয়িষ্ণু ও প্রতিক্রিয়াশীল পর্যায় হিসাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। এই চরম প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে লগ্নীপুঁজির চারিত্রিক বিশিষ্টতা ব্যাখ্যা করে লেনিন দেখালেন ঃ ইতিমধ্যেই কাঁচামালের যেসব উৎসের সন্ধান লগ্নী পুঁজি পেয়েছে, শুধু তা নিয়েই সে সন্তুষ্ট নয়, আরও কত উৎস আছে, সেটাও লগ্নী পুঁজি জেনে তা দখলে আনতে চায়। [Imperialism, Highest Stage of Capitalism, V. I. Lenin] বিশ্বায়নের পটভূমিতে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী লগ্নীপুঁজির ঐক্য ও সংঘাতের প্রেক্ষাপটে, ভারতবর্ষের বিশেষ ক্ষেত্রটিতে বিশেষ সময়ে বিশেষ সমস্যাগুলি যা উত্থাপিত হয়েছে তা আলোচনা করে এখন দেখব, পুঁজির বিকাশের ধারা ও চারিত্রিক বিশিষ্টতা এবং প্রবণতা সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস ও পরবর্তী লেনিনীয় যে বিশ্লেষণ রয়েছে, সেগুলি কীভাবে কিরূপে ক্রিয়াশীল রয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘনীভূত বিশেষ রূপ গ্যাট-এর ভিত্তির ওপর রচিত ডব্লু টি ও-র শরিক হওয়ার আগে ভারতবর্ষের অবস্থাটা কেমন ছিল তা এক নজরে দেখে নেওয়া যাক।

ডব্লু টি ও পূর্ববর্তী অবস্থা

যত দিন যাচ্ছে জমি থেকে উৎপাদক মালিক উচ্ছেদ হচ্ছে। আর হাতছাড়া জমি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মুষ্টিমেয় কৃষি-পুঁজিপতিদের হাতে। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, প্রান্তিক কৃষিজীবীরা ক্রমান্বয়ে পরিণত হচ্ছে নিঃস্ব সর্বহারায়। কংগ্রেসী আমলে ‘সবুজ বিপ্লব’ নিয়ে যে বিস্তর গলাবাজি হয়েছিল তার নীট ফল কি? সবুজ বিপ্লবের ৯০% সুফল পেয়েছে ৫% কৃষক-পুঁজিপতি — যারা ৪০% জমির মালিকানা কুক্ষিগত করে বসে আছে। গরিবরা তেমন কিছুই উপকৃত হয়নি। আই-এল-ও সমীক্ষা করে ’৯০-এর দশকে এই বিপ্লবের ফলাফল সম্পর্কে এমনই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। [সূত্র ঃ Memorandum to the Second National Commission on Labour by UTUC(LS)] জমিচ্যুত হয়ে গ্রামীণ মজুরে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটা দ্রুততর হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। কর্ণাটক সরকার ও ডেনমার্কের এক কোম্পানীর যৌথ মালিকানায় ১৫টি ফুলের জোত গড়ে তোলা হল। পরিণতিতে জমির মালিকরা অধঃপতিত হল ক্ষেতমজুরে। স্রেফ ঋণের দায়ে। সবুজ বিপ্লবের ঘাঁটি পাঞ্জাবে ৯০ শতাংশ তুলো চাষী ঋণের দায়ে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। ‘দি ট্রিবিউন’ পত্রিকা (১৪-৯-৯৮) লিখেছে, ঋণের দায়ে ১০০০ তুলো চাষী আত্মহত্যা করেছে। রপ্তানি বাণিজ্যের মোহময়ী স্লোগানের পিছনে ছুটতে গিয়ে জমির চাষ বদলে যাচ্ছে। কেরালায় ২৫,০০০ হেক্টর জমি যেখানে আগে ধানচাষ হতো তার বদলে রপ্তানি বাজার লক্ষ্য করে অন্য জিনিস চাষ হচ্ছে। ‘দেখাদেখি চাষ, পাশাপাশি বাস’ — এই প্রবাদ আজ তার মান হারিয়েছে। অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রবণতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে গড়ে ওঠা উপরকাঠামোতে পরিপূরক রাজনৈতিক দলীয় নেতা, ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন, কেন্দ্র ও রাজ্যের দক্ষিণপন্থী ও তথাকথিত এ রাজ্যের ‘বামপন্থী’ সরকারও রপ্তানি ও বাজারমুখী চাষের আওয়াজ তুলছে। যেন রপ্তানির বাজার থাকলেই চাষীর লাভ হয়। এমন মিথ্যার বেসাতি করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, তার আগের কংগ্রেস ও বর্তমানের সিপিএম-কংগ্রেস জোট সরকারও। রাজ্যে সিপিএম চালিত সরকারও একই যুক্তিতে একই লক্ষ্যেই এসব কথা বলছে। রাজ্যে রাজ্যে পুঁজিবাদী আঞ্চলিক দলগুলিও একই সুরে একই বক্তব্য প্রচার করছে। সকলেই খোয়াব দেখাচ্ছে, ‘অর্থকরী ফসল’ বুনলে চাষীর দুঃখমোচন হবে।

অর্থকরী ফসলের রপ্তানি-বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মিথ্যাচার

সকলেই জানেন, পাটের বিরাট আন্তর্জাতিক বাজার আছে। তাহলে পাটচাষী লাভজনক দাম পাচ্ছে না কেন? আর পাটকল লে-অফ, লক-আউটে জেরবার কেন? কেনই বা পাটকলগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ পাটকল শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, অনাহারে মরছে? আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতবর্ষ চা-এর অন্যতম প্রধান যোগানদার। তা সত্ত্বেও কেন চা-বাগানগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? কেন ২০০০ চা-বাগান শ্রমিক অনাহারে মারা গেল? কেনই বা চা-বাগান ও পাটকল মজুরদের ছয়দিন কাজ করে তিনদিনের বেতনের চুক্তি মানতে হচ্ছে — তাও আবার বিস্তর শ্রমিক ছাঁটাই মেনে নিয়েই? টেক্সটাইল পণ্য হিসাবে সুতো কাপড়ের ব্যবসায় ভারতবর্ষ দুনিয়ার বুকে জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রচুর রপ্তানি হয়। কিন্তু তা দিয়ে সুতাকল শ্রমিকদের জীবনে, কিংবা তুলোচাষীদের জীবনে অনাহার, ছাঁটাই, দারিদ্র্য ও মৃত্যু ঠেকানো যায়নি। বোম্বে মিলমালিক সংগঠনের চেয়ারম্যান মফৎলাল বলছেন ঃ উদারনীতির ফলেই টেক্সটাইল রপ্তানি ৩৩ শতাংশ বেড়েছে। ১৯৯২-৯৩ সালে দেখা যাচ্ছে, তার আগের তিন বছরের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছে ৯৫ শতাংশ। ৯৫৫৮ কোটি টাকা থেকে টেক্সটাইল রপ্তানি বেড়ে হয়েছে ১৮,৬৪৩ কোটি টাকা। দ্বিগুণ। এর সুফল টেক্সটাইল শ্রমিকদের জীবনে কী বর্তাল? ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ৭৯,৯৮২ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিল। ’৯০-৯১, ‘৯১-৯২, ’৯২-৯৩’এ মোট রপ্তানির পরিমাণ এদেশে যথাক্রমে ৩২,৫২৭.৩, ৪৪,০৪১.৮, ৫৫,৩৫০.৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে কৃষিপণ্যের অংশ যথাক্রমে ৬২১৮.৮, ৮০৮৭.০. ৮৯৭০.০ কোটি টাকা। (সূত্র ঃ D.G.C.I.R.S.S, Calcutta) এর মধ্যে চালের অংশ কত? ভারতীয় চাল রপ্তানিকারক সমিতি জানাচ্ছে চালের অংশ যথাক্রমে ৪৫৬.৭০, ৭৪৯.৯৯, ৮৯৭.৯৮ কোটি টাকার। চাল রপ্তানিবৃদ্ধির সুফল চাষী কী পেল? অনাহার আর মৃত্যু। সুতরাং রপ্তানি বৃদ্ধি পেলেই শ্রমিক-চাষীর কল্যাণ হয় না, দারিদ্র্য যায় না। বরং দেখা যাচ্ছে, বিপরীতটাই — সর্বনাশ। (সূত্র ঃ ডাঙ্কেল প্রস্তাব বিষয়ে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর দলিল, ৭-৬-’৯৪)

> কৃষিবিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক চুরাশি বছর বয়স্ক মাননীয় অমরেন্দ্র পাণ্ডা প্রশ্ন তোলেন, স্বাধীনতার প্রথম চল্লিশ বছর যেখানে চাষীর পেটের দায়ে আত্মহত্যার খবর বিরল ছিল, সেখানে গত দশ বছরে সেই সংখ্যা কেন এত বাড়ল? ... তাঁর অভিযোগ চাষ করার জন্য সার, বীজ সহ অন্যান্য দ্রব্যের দাম গত দশ বছরে তিনগুণ বেড়েছে। অথচ ফসলের দাম তো বাড়েইনি, বরং কমেছে। তাঁর আরও প্রশ্ন ঃ এত প্রযুক্তি নিয়ে আমাদের তাহলে কী লাভ হচ্ছে? কেন অভাবের তাড়নায় একের পর এক চাষী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন? কেন এখনও উৎপাদন এত কম? কেন এখনও উৎপাদনের জন্য এত ব্যয়? চাষ করে চাষীরাই বা এই ২০০৪ সালে এত কম টাকা কেন পাবেন?

দেশের খাদ্য উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা কী? রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য রপ্তানি হয়েছে। ২০০১-০২ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২১ কোটি ২০ লক্ষ টন। ২০02-০৩-এ তা কমে হল ১৮ কোটি ৩২ লক্ষ টন। ২০০৩-০৪-এ হিসেব হয়েছিল ২৯ কোটি ১০ লক্ষ টন হবে। যদিও অনাবৃষ্টির দরুণ কম হয়েছে বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের ১০৮ কোটি লোককে দুবেলা খাওয়ানোর পক্ষে এই পরিমাণ আদৌ যথেষ্ট নয়, বরং কম। খাদ্য রপ্তানি বৃদ্ধির গৌরবের পরিণামে গত পাঁচ বছরে ৩০০০ চাষীকে আত্মহত্যা করতে হল। অর্ধেক মানুষ এদেশে অর্ধাহারে থাকে। (চাষীদের আত্মহত্যা, দি স্টেটসম্যান ৪-১-০৫) আসলে রপ্তানি বৃদ্ধি পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়। ‘উদ্বৃত্ত’ যা রপ্তানি হয়, তাও মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত নয়। বরং প্রয়োজনকে অস্বীকার করে। কারণ, পুঁজিবাদে চাহিদা মানে মানুষের প্রয়োজন নয়। চাহিদা মানে ক্রয়ক্ষমতা, যা নিঃস্ব মানুষের নেই। মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবের ফলেই এই উদ্বৃত্তের জয়গান আমরা শুনছি। এটাই উন্নয়ন!

কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে বাড়বাড়ন্ত নিয়ে যে আড়ম্বর করা হয়ে থাকে, তার কারণ মূলত — এক) সেচ-সেবিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, দুই) আধুনিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগবৃদ্ধি, তিন) উন্নত আধুনিক উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি। প্রধানত উৎপাদনবৃদ্ধির এই তিনটিই হল রহস্য। এর ফলে জমি থেকে একাধিকবার ফসল পাওয়া যাচ্ছে ও উৎপাদন হারের বৃদ্ধি ঘটছে। যদিও ডিজেল ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির দরুণ সেচকর অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় সেচ ব্যবস্থা সংকুচিত হচ্ছে। “ক্যানালের মাধ্যমে সেচ কাজ খুবই অল্প। উত্তরপ্রদেশের মত রাজ্যে ২৫.৪৭ শতাংশ জমিতে ক্যানাল-সেচ হয়ে থাকে। গড়ে-ওঠা সামান্য সেচ কাঠামোটিও ক্রমশ অবক্ষয়িত হচ্ছে, ড্যাম ও ক্যানালগুলি মজে যাওয়ার জন্য। অথচ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে ব্যয়বরাদ্দ কমছে ক্রমশই। ’৯৬-৯৭ সালে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ১৪৩৪.১ কোটি টাকা, ২০০১-০২ সালে ৯০৭ কোটি টাকা। জলসেচের জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নেই। (সূত্র ঃ দি ইকনমিক টাইমস, ২৬-৩-২০০২) মোট জমির অল্পই সেচসেবিত হয় বলে প্রাকৃতিক বৃষ্টি নির্ভরতা সারা দেশে এখনও ঘোচেনি। ২০০৩-০৪ সালে ফসল মার খাওয়ার এটাই অন্যতম কারণ। দেখাই যাচ্ছে যে, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ও সুলভ করার প্রধান যে আয়োজন বা প্রয়োজন — আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের বা প্রযুক্তির প্রয়োগ, তা কৃষিক্ষেত্রে আদৌ হয়নি। যদিও সবাই বলছেন উৎপাদন বাড়াতে হবে, উৎপাদন ব্যয় কমাতে হবে। অথচ তার জন্য কার্যকরী এই ব্যবস্থা কিন্তু কেউ নিচ্ছে না। এই বলার সঙ্গে করার পার্থক্য কেন, সে কথা পরে বলা যাবে।

যা আমরা বলছিলাম, কৃষিপণ্য যা বাজারে আসছে, সেই দেশের বাজারটির নিয়ামক হচ্ছে শিল্পপতিরা বা পুঁজিপতিশ্রেণী। কৃষি উৎপাদনের

চারের পাতায় দেখুন

কৃষি ও কৃষক

উন্নয়নের ধাক্কায় কম খেয়ে বাঁচবার প্রতিযোগিতা চলছে

তিনের পাতার পর

প্রয়োজনীয় কীটনাশক, সার, বীজ, সেচের বিদ্যুৎ, ডিজেল, প্রভৃতির মালিক পুঁজিপতিরা সংকুচিত বাজার থেকে তাদের সর্বোচ্চ মুনাফা সুনিশ্চিত করতে এগুলির দাম ক্রমাগত বাড়িয়েই চলেছে এবং তার নীট ফল হিসেবে কৃষি উৎপাদনের খরচ ক্রমাগত বাড়ছে। আবার সেই উৎপন্ন ফসল যখন বাজারে আসছে, তার দখলটি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে থাকায় দাম নির্ধারণের ক্ষমতাটা তাদেরই কুক্ষিগত থাকে। এই ক্ষমতার জোরে তাদের স্বার্থে চাষীর বিক্রয়যোগ্য ফসলের নির্ধারিত দাম সস্তা হওয়ার দরুণ ছোট উৎপাদনকারী চাষী অলাভজনক দামেই উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় ফসলও কেন্দ্রীভূত হচ্ছে অনেক সস্তায় পুঁজিপতিদের হাতে, খাদ্য-কর্পোরেট সংস্থাগুলির হাতে। পুঁজিপতিদের ইচ্ছেমত দাম নির্ধারণ করার ক্ষমতার সুবাদে উৎপাদক ছোট চাষী আর্থিক ক্ষতির ধারাবাহিক ধাক্কায় জমি হারাচ্ছে, আত্মহত্যা করছে ঋণের দায়ে। কৃষিনির্ভর সংখ্যাগরিষ্ঠের এইভাবে ক্রমাগত ক্রয়ক্ষমতার অবনমন হওয়ার দরুন সামগ্রিক দেশের বাজারটিও সংকুচিত হচ্ছে। অন্যদিকে শিল্প পুঁজিপতিরা উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সর্বোচ্চ মুনাফা সুনিশ্চিত করতে ক্রমাগত শ্রমিক ছাঁটাই, ক্লোজার, লকআউট করে চলেছে। এই সবকিছু মিলে সংকোচনশীল বাজারকে আরও সংকুচিত করছে। ফলে শিল্পসংকটই স্থায়ী বৈশিষ্ট্য, বাজার মন্দাই স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠছে বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির। পুঁজির বাজারসংকটের এই নিয়ম থেকে উন্নত বা অনুন্নত কোনো পুঁজিবাদী দেশেরই আজ পরিত্রাণ নেই। পুঁজিবাদের এই সর্বাত্মক সংকট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন বাজার-সংকটকেও বহুগুণ ছাড়িয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে ছোট, মাঝারি, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষেতমজুরের জীবনে, শ্রমিকের জীবনে দারিদ্র্যবৃদ্ধি যেমন অনিবার্য, তেমনই পুঁজিপতিশ্রেণীর বিপুল মুনাফাবৃদ্ধি, পুঁজির নজিরবিহীন কেন্দ্রীভবনও এ যুগের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

পুঁজিবাদী কেন্দ্রীভবন ও দরিদ্রায়ন

ওয়ার্ল্ড কনফেডারেশন অফ লেবারস শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে তাদের বার্লিন (২০০০) রিপোর্টে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে লিখেছে ঃ ‘‘আমাদের অধিকাংশ সরকার কর্তৃক অনুসৃত নয়া উদারনীতির পরিণামে শ্রমিক ও কৃষি মজুরদের উপর শোষণ চলছে। শোষণ, জমি থেকে উচ্ছেদ ও মুষ্টিমেয়র হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি গ্রামীণ পরিবার দারিদ্র্য ও ক্ষুধার মধ্যে দিন কাটায়, জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলিও তারা পায়না…।’’ আন্তর্জাতিক শ্রমসম্মেলনে এই রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। (সূত্র ঃ ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী)

সুতরাং নয়া আর্থিক নীতি যা বিভিন্ন সরকারগুলি অনুসরণ করছে, তার পরিণতিতে শ্রমিক এবং কৃষিজোত শ্রমিকরা দারুণভাবে শোষিত হচ্ছে, এবং ৫০ শতাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মনুষ্যেতর অবস্থায় বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। আবার পাশাপাশি জমির কেন্দ্রীভবনও ঘটছে দ্রুত, জমা হচ্ছে মুষ্টিমেয় কৃষি পুঁজিপতিদের হাতে। এ সত্য কারুর মনগড়া নয়। সেমিনারে বিদ্বজ্জন ও পণ্ডিতরা যাই বলুন, স্বাধীনতার চল্লিশ বছর কালপর্বেও এই চাষীদের অবস্থা, অর্থাৎ কৃষি-নির্ভর সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। দারিদ্র্য-অনাহার ছিল নিত্যসঙ্গী। আবার এমন নয় যে, জমির কেন্দ্রীভবন ও খুদে জমি মালিকদের জমিহারা হয়ে সর্বহারায় পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটা সেসময়ে বন্ধ ছিল। এদেশে ১৯৪৭ সালে পুঁজিপতিশ্রেণী ক্ষমতায় আসার দরুণ পুঁজিপতিশ্রেণীর দল কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ক্রমাগত সংহত ও শক্তিশালী হওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়েই দরিদ্রায়ন ও পুঁজির কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়াটা ত্বরান্বিত হয়েছে। বাস্তব সত্য কল্প-কথার চাইতেও অনেক কঠিন।

১৯৫১ সালে দেশে মোট ভূমিহীন কৃষি মজুরের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৭৫ লক্ষ। ’৬১ সালে তা বেড়ে হয় ৩ কোটি ১০ লক্ষ, ১৯৮১ সালে হয় ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ। ১০ বছর পর ১৯৯১ সালের জনগণনা তথ্য অনুযায়ী দেশে মোট ভূমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ কোটি ৪৬ লক্ষ। এখানে ভূমিহীন কৃষিমজুরদের হিসাবের মধ্যে অস্থায়ী মজুরের সংখ্যা ধরা হয়নি। কেবল স্থায়ী মজুরদেরই ধরা হয়েছে। এভাবে ক্রমাগত ভূমিহীন মজুরের সংখ্যাবৃদ্ধির উল্টোদিকের ছবিটা হচ্ছে, জমি মুষ্টিমেয় মালিকের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া। জমির মালিকানা সংক্রান্ত সরকারি তথ্য অনুযায়ী গ্রামীণ পরিবারগুলির ৬১ শতাংশের হাতে বড়জোর ৮ শতাংশ জমি আছে। এর মধ্যে ২২ শতাংশের কোন জমিই নেই, ২৫ শতাংশের হাতে জনপিছু মাত্র ৩ বিঘা পরিমাণ জমি আছে। সুতরাং মাত্র ৩৯ শতাংশের হাতে রয়েছে ৯২ শতাংশ জমি। (তথ্য ঃ ইন্ডিয়ান ইকনমি, দত্ত ও সুন্দরম)

এই সময়ে রোজগারপাতির হালচাল কেমন ছিল? সে ছবিও মর্মান্তিক। ১৯৬১ সালে ক্ষেতমজুররা বছরে গড়ে ৯২ দিন বেকার থাকত। ৪র্থ পরিকল্পনার শেষে এরা বেকার থাকছে বছরে গড়ে ২৫০ দিন। বেড়েই চলেছে এই হার। নইলে আজ ১০০ দিন কাজের গ্যারান্টি দিতে আইন করার কথা বলা হচ্ছে কেন? ১৯৬১ সালে গ্রামের চাষী পরিবারের শতকরা ৪ ভাগের হাতে, অর্থাৎ জোতদারদের হাতে আবাদযোগ্য মোট জমির ২৪ ভাগ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে এই প্রক্রিয়ায় ঐ ৪ ভাগের হাতে জমির পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল ৩১ ভাগ। বছরে সমস্ত পরিবারের চাষ থেকে মোট আয় ছিল ৩ হাজার কোটি টাকা, আর মাত্র ২০টি বৃহৎ জোতদার পরিবারের আয় ছিল এই কালপর্বে বছরে ৫ হাজার কোটি টাকা।

ইকনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলির ১৮ ডিসেম্বর ’৬৬তে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা রিপোর্টে তখনকার জীবনযাত্রার একটা মর্মান্তিক দলিল পাওয়া যায়। তাতে দেখা যায়, ‘‘১৯৬০-৬১ সালে জিনিসপত্রের দাম-দরের হিসাবে মাসে মাথাপিছু ন্যূনতম ১৮ টাকা খরচ ধরলে, ৩৮ ভাগ লোকের আয় তার চেয়েও কম ছিল। ১৯৬৪-৬৫তে এই সংখ্যা হয় ৪৪ ভাগের বেশি। ’৬৭-’৬৮তে হয় ৫৩ শতাংশ। তখন দেশে ৫৫ কোটি লোক-সংখ্যার মধ্যে গ্রামের মানুষের ৭০ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ২৯ কোটি লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করত। দেখা যায়, ঐ সময়ে রাজ্যে ৭০ শতাংশ মানুষ গড়ে প্রতিদিন ৮০ পয়সার বেশি খরচ করতে পারত না। এর মধ্যে ২০ শতাংশ দৈনিক ৪৪ পয়সা খরচ করত। যারা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দারিদ্র্যবৃদ্ধির কারণ হিসাবে দেখাতে চান, এই রূঢ় সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে তারা কী জবাব দেবেন?

শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি ঃ অতীত থেকে বর্তমানের গতিপ্রকৃতি

প্রশ্ন হতে পারে, শোষণের ধরন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা, অতীতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি, বর্তমানে কি হুবহু এক? না — নিশ্চয়ই এক নয়। শোষণের, দরিদ্রকরণের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বেড়েছে। গরিব শোষিত জনতার প্রতি দায়বদ্ধতা সীমিত অর্থে সরকারের যতটুকু ছিল, তাও আজ কমেছে। ভারতীয় একচেটে পুঁজি ও বিদেশি পুঁজি এবং তাদের মিলিত জোট কর্পোরেট সংস্থাগুলির যৌথ উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় মধ্যচাষী, নিম্নচাষী, প্রান্তিক চাষী ও কৃষি মজুরদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। জমির ওপর এবং উৎপন্ন ফসলের ওপর এই জোটের পুঁজিপতিদের দখলদারী তৃণমূল স্তর পর্যন্ত আরও ব্যাপক, আরও সুদৃঢ় হয়েছে, যার পরিণামে অনাহারে মৃত্যু ও দারিদ্র্য বেড়েছে। বেড়েছে ছিন্নমূল মজুরের (migrant labour) সংখ্যা। এখন দেখা যাক, ‘গরিবদের বাঁচাতে’ সরকারি সহায়তা অতীতে কি ছিল, বর্তমানেই বা তা কিরূপ? সহায়তার বাস্তব প্রক্রিয়াটির পরিবর্তনের ধারাটা কেমন?

কৃষিতে দু’ধরনের সহায়তা চলত ভর্তুকি দিয়ে। একটা প্রত্যক্ষ, অপরটা একটু অপ্রত্যক্ষ। এক) ২০টা কৃষিজাত পণ্যের (যেমন, পাট) ন্যায্য দাম পাওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হত; দুই) সার, সেচ, বীজ, বিদ্যুৎ, ডিজেল, কৃষিঋণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এর উদ্দেশ্যটা ছিল ফসলের উৎপাদন খরচ কম করে রাখা, যাতে ব্যাপক সংখ্যায় চাষীদের উৎপাদনের কাজে যুক্ত রাখা যায়, বাজারে উৎপাদিত শস্যের দাম সাধ্যমত সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা যায়। এই পরিকল্পনার মধ্যে ভারতের মতো উচ্চাকাঙ্খী একটি বিকাশশীল পুঁজিবাদী দেশে শিল্প শ্রমিকের মজুরির হার কম রেখে শিল্পপুঁজিপতিদের পুঁজির শক্তিবৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্য ছিল। এই অর্থে জনকল্যাণ তাদের আর্থিক পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলনা। একই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে চাষীর উৎপন্ন ফসল নির্ধারিত দামে ক্রয়ের সরকারি ব্যবস্থা, রেশনে কম দামে খাদশস্য দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হয়েছিল। এজন্য এইসব ক্ষেত্রে সরকারিভাবে অর্থসাহায্য দিতে হত, যাকেই বলা হত ভর্তুকি। ১৯৯৪ সালে ডব্লু টি ও গঠনের চুক্তিতে সই করার আগে ’৮০-র দশক থেকেই কংগ্রেস সরকার এই নীতি ও রীতি থেকে সরে আসতে শুরু করে। ’৯৪-এর গ্যাটচুক্তি অনুযায়ী নীতি হল ঃ নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে কৃষিতে ভর্তুকি তুলে দিতে হবে। সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাগুলি ক্রমাগত কমিয়ে দিতে হবে, যাতে শেষপর্যন্ত ভারতীয় কৃষি-পণ্যের বিশ্ববাজারের পণ্য হওয়ার পথে বাধা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটে। আজ এই নীতির রূপায়ণ হচ্ছে। অবশ্য একথা ভুললে চলবে না যে, সাধারণ মানুষ ও চাষী আপাত খানিকটা সুবিধা পেলেন ও অতীতের চালু কৃষিনীতির প্রধান ফয়দা লুটে নিত জোতদার কৃষিপুঁজিপতিরাই। আমাদের দেশে ২৪.৩৩ শতাংশ বড় বা মাঝারি মাপের জোত আছে। এদের অধীনে মোট জমির পরিমাণ ৭১ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে যে, সেচের ৬১.৬৫%, সারের ৬৬.০৬%, স্বল্প-মেয়াদী ঋণের ৫৭.৩৫%, বিদ্যুৎচালিত পাম্পের ৬৪.৭০% এরাই ব্যবহার করে। (কৃষি সেনসাসের সর্বভারতীয় রিপোর্ট ১৯৮৫-৮৬) ডব্লুটিওতে স্বাক্ষর করার পর জাতীয় কৃষি ও ভূমিসংস্কার নীতিটি আসলে ঐ প্রক্রিয়াটিকেই আরও সুসংহত ও ব্যাপক করে নিশ্ছিদ্রভাবে কৃষিক্ষেত্রে শোষণের নেটওয়ার্কের জন্ম দিয়েছে।

দেশের রেশন ব্যবস্থাটাও আক্রান্ত হচ্ছে যুক্তির আড়ালে। রেশনে সস্তায় খাদ্যশস্য সরবরাহ নির্ভর করে সরকারি ভর্তুকির ওপর। সুতরাং চুক্তিতে যখন বলা হল, সরকারকে বাজার দরে শস্য কিনতে হবে এবং বাজারদরের চেয়ে সস্তায় বিক্রি করা চলবে না তখন রেশন ব্যবস্থা যে ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হবে, তা আর আশ্চর্য কি? হচ্ছে তো এটাই। লক্ষণীয় যে, ’৯২-৯৩ এর বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য ও খাদ্যশস্য উৎপাদন খাতে ভর্তুকি কমিয়ে দেয় ২০০০ কোটি টাকা। এই প্রক্রিয়া তারপর প্রতি বাজেটেই অনুসরণ করা হয়েছে। তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী গ্যাটনীতির প্রবক্তা হয়ে বললেন ঃ ‘ভর্তুকি ও সংরক্ষণের সম্ভাব্য ফল হল সম্পদের অপচয়, জনকল্যাণমূলক কাজের ব্যয়বৃদ্ধি ও উৎপাদন দক্ষতার অপচয়।’ জনসেবার ক্ষেত্রগুলি থেকে ভর্তুকি তুলে দেওয়ার এই প্রক্রিয়াটি পরে ত্বরান্বিত হয়েছে, ব্যাপকতা পেয়েছে। বিজেপি জোট সরকার ও বর্তমান সিপিএম-কংগ্রেস সরকারও এই রাস্তায় দৌড়াচ্ছে। এদের এই নীতির ফলেই বিদ্যুৎ, সেচ, সার, কীটনাশক, ডিজেল প্রভৃতির দাম বাড়ছে। কৃষি উৎপাদন হয়ে যাচ্ছে অনেক দামী — কারণ উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে। অথচ উৎপাদিত ফসল লাভজনক দামে কিনবার সরকারি ব্যবস্থা কার্যত নেই। একদিকে চাষী অভাবে পড়ে যে ফসল বিক্রি করছে তার দাম পাচ্ছেনা। অপরদিকে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিস তাকে কিনতে হচ্ছে পুঁজিপতিদের নির্ধারিত বাজার দরে। এই দ্বিমুখী আক্রমণে চাষী-মজুরদের জীবনে এসেছে বিপর্যয়। জমি তো হাতছাড়া হবেই। পেটের জ্বালায় আত্মহত্যা বাড়ছে। উন্নয়নের ধাক্কায় কম খেয়ে টিকে থাকার বর্বর ক্ষমতার প্রতিযোগিতা চলছে। গত ৬ বছরে জনপিছু খাদ্যশস্য গ্রহণের পরিমাণ কমতে কমতে বছরে ১৫৫ কিলোগ্রামে নেমেছে। দেশের অগ্রগণ্য অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, এই শোচনীয় অবস্থা ইতিপূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকের বছরগুলিতে, বাংলার মন্বন্তরে ও কিছুটা ১৯৬০ সালে খাদ্যসংকটের সময় দেখা গিয়েছিল (দি হিন্দু ৩১-৭-০৪)। বুঝুন, অবস্থা কতটা ভয়াবহ হলে রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন, ২০০০ সালে গণপ্রজাতন্ত্র দিবসে বলতে বাধ্য হন ঃ ‘‘এই হৃদয়হীন সমাজে ক্রমাগত বাড়তে থাকা বৈষম্য কোন না কোনও বিপ্লব ঘটাবে।’’(ঐ) কেন্দ্রীয় সরকারের গুদামে খাদ্য মজুদ ৬ কোটি ২০ লক্ষ টন, যা বাফার-স্টকের (সুরক্ষা পরিমাণ) অনেক বেশি। অথচ সরকারি হিসাবেই ২৬ কোটি মানুষ অর্ধাহারে। এই রাজ্যেও ২ কোটি মানুষ

পাঁচের পাতায় দেখুন

১৯৬০-৬১ সালে জিনিসপত্রের দাম-দরের হিসাবে মাসে মাথাপিছু ন্যূনতম ১৮ টাকা খরচ ধরলে, ৩৮ ভাগ লোকের আয় তার চেয়েও কম ছিল। ১৯৬৪-৬৫তে এই সংখ্যা হয় ৪৪ ভাগের বেশি। ’৬৭-’৬৮তে হয় ৫৩ শতাংশ। তখন দেশে ৫৫ কোটি লোক-সংখ্যার মধ্যে গ্রামের মানুষের ৭০ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ২৯ কোটি লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করত। দেখা যায়, ঐ সময়ে রাজ্যে ৭০ শতাংশ মানুষ গড়ে প্রতিদিন ৮০ পয়সার বেশি খরচ করতে পারত না। এর মধ্যে ২০ শতাংশ দৈনিক ৪৪ পয়সা খরচ করত। যারা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দারিদ্র্যবৃদ্ধির কারণ হিসাবে দেখাতে চান, এই রূঢ় সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে তারা কী জবাব দেবেন?

বরাদ্দ টাকা ফেরত যায়

মানুষ মরে বিনা চিকিৎসায়

কোনও দিন যদি আর্থিক বছরের শেষ দিনটিতে (৩১ মার্চ) ট্রেজারি অফিসগুলিতে একবার উঁকি মারেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই দেখতে পাবেন কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল কর্মতৎপরতা। দেখতে পাবেন, ট্রেজারি অফিসে উঠে এসেছে সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিসগুলি। বিডিও অফিসের অফিসার এবং কর্মচারীরা মেঝেতে সতরঞ্চি পেতে বসে গেছেন গ্যাঁট হয়ে। মাঝে মাঝে খবর নিচ্ছেন জেলা শাসকের অফিস থেকে আর কোন ফ্যাক্স-ট্যাক্স এল কিনা। ফ্যাক্স বলতে এক্ষেত্রে বুঝতে হবে অ্যালটমেন্ট অর্ডার বা অর্থ বরাদ্দের আদেশ। বছরের শেষ দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর জেলা শাসকের অফিসে ফ্যাক্স মারফৎ অর্থ বরাদ্দের আদেশ পাঠায়। জেলা শাসকের দপ্তর থেকে সেগুলি পুনর্বণ্টিত হয়ে নির্দেশ যায় বিডিও তথা নির্বাহী আধিকারিকদের কাছে। নির্বাহী আধিকারিকেরা ট্রেজারি অফিসে বসেই সেগুলি সংগ্রহ করেন এবং বিল জমা দিয়ে ট্রেজারি থেকে চেক সংগ্রহ করেন। ওইদিন বিল জমা দিয়ে চেক নিতে না পারলে বরাদ্দ অর্থ ফেরত চলে যাবে, তাই এই ধরনের অতি তৎপরতা। আগেকার দিনে রাত শেষ হয়ে ১ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত কাজ হতো। এখন কম্পিউটারের সাহায্যে ৩১ মার্চ মধ্য রাত্রির মধ্যেই কাজ গুটিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, এই যে যুদ্ধকালীন তৎপরতা, এটা মূলত কর্মচারীদের পাওনাগণ্ডা এবং প্রশাসনিক ব্যয়ের নিমিত্ত বরাদ্দ অর্থ তুলে নেওয়ার জন্য। কিন্তু উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির ব্যয়ের হিসাব তো আর এভাবে দেখানো যায় না। অথচ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির জন্যও বরাদ্দ অর্থের শেষ কিস্তিটি পাঠানো হয় বছরের শেষ মাসের একেবারে শেষ লগ্নে। ফলে, এই অর্থ ওই আর্থিক বছরের মধ্যে খরচ না হয়ে ফেরত চলে যায়। নতুবা বরাদ্দ বাঁচাতে জমা রাখা হয় পি এল অ্যাকাউন্টে। তারপর চলে হিসাব নিয়ে নানা খেলা, খাত বদলের পালা।

সরকারি নিয়মানুসারে বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য অর্থ বরাদ্দের আদেশ স্তরে স্তরে পাঠানো হয় কিস্তিতে, তিন বা ছ'মাস অন্তর। প্রথম কিস্তির অর্থের সদ্ব্যবহারের সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত পরবর্তী কিস্তি দেওয়ার নিয়ম নেই। প্রথম কিস্তির টাকা এমনভাবে পাঠানো হচ্ছে যে কিস্তির বরাদ্দ যখন নানা স্তর ভেদ করে একেবারে নিচের স্তরে পৌঁছাচ্ছে, ততদিনে উপরের স্তর থেকে দ্বিতীয় কিস্তির বরাদ্দ ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে প্রথম কিস্তির অর্থের সদ্ব্যবহারের সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য চাপ বাড়তে থাকে। উপরের চাপাচাপিতে বাধ্য হয়ে নিচের দিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলি মনগড়া খরচের একটা হিসাব পেশ করে পরবর্তী বরাদ্দ পেতে চায়। এই প্রক্রিয়ায় হিসাব চালাচালির ফলশ্রুতি হিসাবে সব-সময়ের জন্য একটা অসঙ্গতি থেকেই যায়। এর উপরে যদি বাড়তি প্রশাসনিক অকর্মণ্যতা যুক্ত হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

সম্প্রতি এই বাড়তি প্রশাসনিক উদ্দেশ্যমূলক অকর্মণ্যতাই প্রকাশ পেয়েছে একটি সংবাদে। সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার তার বাজেট বরাদ্দের ৩৫ শতাংশ, অর্থাৎ ৩০ হাজার কোটি টাকা এখনও খরচ করেনি। অথচ ২০০৪-০৫ আর্থিক বছর শেষ হতে আর মাত্র দু'মাস বাকি। দীর্ঘ দশ মাস সময়েও যারা ৬৫ শতাংশের বেশি অর্থ ব্যয় করে না, তারা যে মাত্র দু'মাসে বাকি ৩৫ শতাংশ অর্থ ব্যয় করতে সমর্থ হবে না, তা বলাই বাহুল্য। দেশ স্বাধীন হওয়ার ৫৭ বছর পরেও দেশের মানুষ যখন সরকারি পরিষেবার অভাবে মনুষ্যেতর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন তখনও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের এই উদ্দেশ্যমূলক অব্যবহারকে আপনি কীভাবে মেনে নেবেন? এর কি কোনও ক্ষমা হয়? এই সংবাদে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি নাগরিকই ক্ষুব্ধ হবেন বুঝতে পেরে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঘুবংশপ্রসাদ সিংহ অকপট (নাকি কপট!) স্বীকারোক্তি করে বলেছেন, কিছু ক্ষেত্রে কাজে ঢিলেমির জন্য এবং বাকি ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে মুক্ত থাকতে গিয়েই দেরি হয়েছে'' (আনন্দবাজার ২৬/০১)। যে ৩০ হাজার কোটি টাকা এখনও খরচ হয়নি, তার মধ্যে আট হাজার কোটি টাকাই গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের। গ্রামগুলি অশিক্ষায়, অন্ধকারে, কাদাজলে ডুবে থাকবে, অথচ গ্রামোন্নয়নের বরাদ্দ অর্থ খরচ করা যাবে না !

দেশের যে কোনও রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে খোঁজখবর নিলে সকলের মুখে মুখে যে দাবিটি সব থেকে আগে শোনা যাবে, সেটি হলো রাস্তার দাবি। অথচ চলতি আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের অর্ধেকও খরচ করা হয়নি। বাকি অর্ধেকের বেশি (৫৪ শতাংশ) অর্থ আগামী দু'মাসের মধ্যে ব্যয় করা যাবে, একথা পাগলেও মানবে না। জাতীয় সড়ক নির্মাণ সংস্থা ইতিমধ্যেই ১২০০ কোটি টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছে। এইভাবে বরাদ্দ অর্থ অব্যবহৃত রাখলে পরবর্তী বাজেটে তার প্রভাব পড়ে। ধরে নেওয়া হয়, ঐ নির্দিষ্ট খাতে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যেই ছকমাফিক অর্থমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন — যেসব মন্ত্রক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা খরচ করতে পারছে না, তাদের আগামী বছরের বাজেটে ১০ শতাংশ বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ আগামী বাজেটে কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবহন থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি মন্ত্রকের বাজেটেই কোপ পড়তে চলেছে। সরকার বলছে যে 'আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে মুক্ত থাকতে গিয়েই দেরি হয়েছে', সেখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটানোর বদলে বাজেট কাটার এই বন্দোবস্ত কেন? এখানেই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে।

সরকারি অর্থ যথাসময়ে ব্যয়িত না হওয়ার জন্য সরকার কি তাহলে প্রকারান্তরে জনসাধারণকেই দায়ী করছেন? দেশে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে, বাড়ছে অনাহারে মৃতের সংখ্যা। উদারনীতির অনুদার দরিয়ায় নৌকো ভাসিয়ে এই মৃত্যু রোধ করা যাবে না। তবু লোকদেখানো যেটুকু 'কর্মসৃজন'-এর পরিকল্পনা নেওয়া দরকার, সেটাও আজ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কৌশলী অপদার্থতার কারণে ধাক্কা খেতে বসেছে। ধাক্কা খেতে বসেছেন স্বাস্থ্য সমস্যায় বিপর্যস্ত দেশবাসীও। চলতি আর্থিক বছরের বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে যে সামান্য ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছিল তার মাত্র ৪৯ শতাংশ, অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম গত ডিসেম্বর পর্যন্ত খরচ করা হয়েছে। বাকি অর্থ পরবর্তী তিন মাসে কী করে খরচ হবে? অথচ দেশে বহু মানুষ বিনা চিকিৎসায় অকালে প্রাণ দিচ্ছেন, বহু মানুষ চিকিৎসা-ব্যয় বহন করতে গিয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হচ্ছেন। আমাদের এই উন্নততর বামফ্রন্ট সরকারের সর্বোন্নত রাজ্য সম্পর্কে সম্প্রতি একটি সমীক্ষা-রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে — জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা বা সংক্ষেপে এন এস এস ও। তাতে বলা হয়েছে, এই রাজ্যে যত পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে তার শতকরা ২৫ ভাগই চিকিৎসা সংক্রান্ত বিপুল ব্যয় বহন করতে গিয়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে বা যাচ্ছে। এই রাজ্যের এই হাল হলে অন্য রাজ্যের অবস্থাও কমবেশি একই হওয়ার কথা। তাহলে গরিব মানুষের চিকিৎসার জন্য যখন সরকারি ব্যয় অনেকগুণ বাড়ানো প্রয়োজন, তখন সামান্য যেটুকু ব্যয়বরাদ্দ বাজেটে ধরা হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক প্যাঁচে ফেলে সেটুকুও পুরোটা ব্যয় করা হচ্ছে না।

আরও মজার ব্যাপার হলো, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সীমাহীন অপদার্থতা নিয়ে যারা সবচেয়ে বেশি সরব হতে পারতো, সেই বামফ্রন্টের শরিকদলগুলি অদ্ভুত রকমের নীরব, নিশ্চুপ। একটা সময় পর্যন্ত তবু এদের মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ শোনা যেত। এখন কংগ্রেসের পক্ষপুটে আশ্রয় নেওয়ার পর কেন্দ্রের সরকার যেন বামফ্রন্ট সরকারের সহোদর ভ্রাতা হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করতে ব্যর্থ হওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার মুখই বা এদের কোথায়? এরা নিজেরাই তো কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নির্দিষ্ট সময়ে ব্যয় করতে পারে না, ফেরত চলে যায়। ২০০২-০৩ সালে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় অনুন্নত গ্রাম এলাকায় সড়ক তৈরির প্রকল্পে এই রাজ্যকে দেওয়া হয়েছিল ৪৪৪ কোটি টাকা। তার মধ্যে খরচ করতে পেরেছিল মাত্র ২০১ কোটি টাকা, অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম (আনন্দবাজার, ১৯-৯-০৩)। শুধু সড়ক যোজনাই নয়, শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ প্রতিটি খাতেই নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ ব্যয় করতে ব্যর্থ হয়েছে এই সরকার। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে নীরব থাকাই এদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সমীচীন নয় কি?

(ঝড় পত্রিকার সৌজন্যে, ৬-২-০৫)

কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন

এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের লিখিত অথবা টেপরেকর্ড করা কোন আলোচনা বা বক্তৃতার কপি যদি কারোর কাছে থাকে তাহলে অতি সত্বর তা দলের কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদকের উদ্দেশে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটি দলের সদস্য, সমর্থক ও দরদীদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশের জন্য সেগুলি প্রয়োজন।

কৃষি ও কৃষকের সমস্যা

চারের পাতার পর

অর্ধাহারে আছে। রেশনে সুলভে খাদ্যশস্য দিলে 'বাজার মার' খাবে, তাই জনসাধারণের খাদ্যভাণ্ডার আজ ফুড কর্পোরেট গোষ্ঠীর কব্জায় তুলে দেওয়া হচ্ছে। কৃষিপণ্যের বাজারকেও উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। আবার দেশের বাজারেও পুঁজির শক্তি বাড়িয়ে তার নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। সরকারি এই নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্যাট-এর অনুকূলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করেই রেখেছিল। গ্যাট সেই অনুসৃত নীতিতে গুণগতভাবে নতুন মাত্রা এনেছে। বীজের চাহিদা বাড়তে বাড়তে ২০০০ সালে হয়েছে ১০ লক্ষ টন। এটা দু-দশকের মধ্যে হয়ে যাবে ১৮ লক্ষ টন। ৩৮ শতাংশ বীজ সংগৃহীত হয় সরকারি সূত্রে, ৬২ শতাংশ প্রথাগত সূত্রে। গ্যাটনীতির ফলে সরকারি বীজ যেমন দুর্মূল্য হয়ে যাচ্ছে তেমনি সমগ্র প্রথাগত বীজ উৎসের ক্ষেত্রটিও ধীরে ধীরে পেটেন্ট ও সুইজেনেরি ব্যবস্থার মধ্যে দেশি-বিদেশি মালিকদের পুঁজির অবাধ লুটের ক্ষেত্র হয়ে যাচ্ছে। এই নীতির জন্য পাটচাষীও মরছে। জুট করপোরেশন অব ইন্ডিয়া কার্যত পাট কেনা বন্ধ রেখেছে। '৯৯ সালে এই রাজ্যে একটু পাটও তারা কেনেনি। মিল মালিকদের ১০০ ভাগ কবজায় চলে গেল পাটচাষী — হল সর্বস্বান্ত। জলের দরে পাট চলে গেল মজুতদার আর মিল মালিকদের ঘরে। প্রয়োজন ছিল সরাসরি ধান, পাট প্রভৃতি সরকারের কিনে নেওয়া। এই রাজ্যে তা উল্টো হল। সরকারি সার্কুলারে বলা হল, ধানচাল কিনবে ধানকল মালিকরা, সরকার কিনবে মালিকদের কাছ থেকে। বেড়ালের ওপর মাছ পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিলে যা হয় তাই হল। সব্জি, আলু প্রভৃতি আনাজপাতি চাষ করে চাষী মার খায়। মাঠের টমাটো, কপি, আলু মাঠেই পচে। যদি সরকারি প্রক্রিয়ায় কিনে হিমঘরে এসব রাখার সুযোগ থাকত, গরিব চাষী বাঁচত। যত হিমঘর আছে, তার মাত্র ৫ - ৬ শতাংশ সরকারি। তাছাড়া এসব কৃষিপণ্য সরকার কেনে না, তাই চাষীও মরে। লাভের গুড়ে পেট মোটা হয় ফাটকাবাজদের, মজুতদারদের। আলু ২ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে চাষীকে নিজের জন্য সেই আলুই কিনতে হয় ৪/৫ টাকা বা তারও বেশি দরে। মরণ তার দু'দিক থেকেই।

ডব্লুটিও'র চুক্তি অনুযায়ী আমদানী-রপ্তানীর নিয়মটাই পাল্টে গেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির হিসেবে যে পণ্যের ঘাটতি, তা আমদানী হত, যা উদ্বৃত্ত, রপ্তানী হত সেই পণ্যের। তাজ্জব ব্যাপার হল, ডব্লুটিও'র চুক্তিতে বলা হল, আবশ্যিকভাবে ৩ শতাংশ খাদ্যশস্য আমদানী করতেই হবে, উদ্বৃত্ত হলেও। আমেরিকার মত কয়েকটি দেশের বিপুল 'উদ্বৃত্ত' খাদ্যশস্যের বাজার তৈরি করতেই এই কৃষিচুক্তির জন্ম হল। তাতেও রক্ষে নেই। কৃষিপণ্যের প্রবেশ পথকে মসৃণ করতে কৃষকের জন্য যেভাবে ভর্তুকি দেওয়া হত তাকে বন্ধ করতে চুক্তি হল, কৃষিপণ্যের মোট মূল্যের ১০ শতাংশের বেশি ভর্তুকি দেওয়াই যাবে না। অথচ ১৯৯৫ সালে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি যাদের কৃষক পিছু ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ২০,০০০ থেকে ২৮,০০০ ডলারের মধ্যে, তারা কিন্তু এর ৮০ শতাংশ ভর্তুকি বজায় রাখতে পারবে। আমদানি বাড়াবার এই শর্তগুলোর সঙ্গে ২০০৫ সালের মধ্যে 'উন্নয়নশীল' দেশগুলোকে তাদের রপ্তানীর ওপর শুল্ক কমানোর শর্তও জুড়ে দেওয়া হল। আবার উল্টোদিক থেকে, ভারতের মত দেশগুলোর পণ্য রপ্তানীর উপর আমেরিকার সর্বোচ্চ শুল্ক হার ১৫০ শতাংশ, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ১২০ শতাংশ থেকে গেল। (১৯৯৭-এর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা ও ইউনাইটেড নেশনস্ কনফারেন্স অন ট্রেড ডেভেলপমেন্ট-এর যৌথ সমীক্ষা) তাহলে একদিকে কৃষি সহায়তা ছাঁটাই করা হল, কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেল, অপরদিকে আমদানির দরজা হাট করে খুলে দেওয়া হল। ফলে কৃষিপণ্য ও খাদ্যপণ্য নামমাত্র দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়ে চাষীর সর্বনাশ সুনিশ্চিত হয়ে গেল। তাছাড়া বেহাল 'লেনদেন ব্যালান্স', বাড়তি আমদানীর ফলে আরও বেহাল হয়ে পড়ল। অবাধ বাণিজ্যনীতির আড়ালে আমেরিকার মত সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজির প্রাধান্যই কায়েম হল। (যোজনা পত্রিকা গোষ্ঠীর ধনধান্যে, জানুয়ারী সংখ্যা ২০০৫)। অবশ্য বলে রাখা ভাল, পরিষেবার ভর্তুকি কমতে থাকলেও, কৃষি পুঁজিপতিদের বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মুনাফা করবার ক্ষমতা বৃদ্ধির যোগান হিসাবে রপ্তানীকারকরা বিপুল ভর্তুকি পেয়ে থাকে। নানাভাবে সরকারি নীতির দরুণ অর্থসাহায্য পায়। (পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য)

ত্রিপুরা

অনলাইন লটারির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

ত্রিপুরার সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ৪ ফেব্রুয়ারি অনলাইন লটারি নামক জুয়া পুনরায় চালু করল। প্রবল গণবিক্ষোভের চাপে পড়ে পশ্চিমবাংলায় সিপিএম ফ্রন্ট সরকার এই লটারির বিরুদ্ধে লোকদেখানো পুলিশি অভিযান চালিয়েছে। ত্রিপুরায় রাজস্ব আয়ের নামে এই লটারি চালু করায়, সিপিএমের জনস্বার্থবিরোধী চরিত্র আর একবার নগ্ন হয়ে গেল। এই লটারি বন্ধের দাবিতে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে আগরতলায় এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বটতলায় একটি প্রতিবাদ সভায় সমবেত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড শিবানী দাস। তিনি বলেন, সিপিএম ফ্রন্ট সরকার দক্ষিণপন্থী সরকারগুলির মতো জনগণের নীতিনৈতিকতা, মূল্যবোধ, বিবেক, চরিত্র মেরে দেওয়ার জন্য ঢালাও মদের লাইসেন্স দিচ্ছে, অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে। এর সঙ্গে সোনায় সোহাগার মত অনলাইন লটারি যুক্ত করেছে। এই সর্বনাশা জুয়ার প্রতিবাদে সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজনকে ঐক্যবদ্ধ করে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

মুর্শিদাবাদ

পঠনপাঠনের অব্যবস্থার প্রতিবাদে অভিভাবকরা

রানিনগর হাইস্কুলে দীর্ঘদিন ধরে অরাজকতা চলছে। ম্যানেজিং কমিটি নেই, নেই প্রধান শিক্ষক। শিক্ষকের সংখ্যা অপর্যাপ্ত। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪০০০, তুলনায় ঘরের সংখ্যা কম। দীর্ঘ বছর ধরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ক্লাস সপ্তাহে তিনদিন চলছে। স্বাভাবিক নিয়মেই অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ। অভিভাবকদের অভিযোগ, খাতাপত্রে কারচুপি করে ক্রমাগত অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। তাই স্কুলের সুষ্ঠু পঠন-পাঠনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে অভিভাবক, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী মানুষদের নিয়ে গঠিত ''শিক্ষা অধিকার কমিটি'' ইতিমধ্যে কনভেনশন, বিডিও, ডিআই এবং জেলা শাসকের নিকট গণস্বাক্ষর সম্বলিত ডেপুটেশন দিয়েছে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১০ ফেব্রুয়ারি রানিনগর হাইস্কুলের দুর্নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ-অবস্থান ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালিত হয়। অভিভাবকবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন — শামসুল হক, আনারুল ইসলাম, মুজিবর রহমান, ইস্রাফিল হোসেন, আলি-আকবর ও প্রাক্তন ছাত্র রৌশন-আল-হেলাল প্রমুখ। তাঁরা বলেন, স্কুলের উন্নয়নের নামে প্রায় ৩০০০ ছাত্রছাত্রীর প্রত্যেকের কাছ থেকে ৬৭ টাকা সেসন চার্জ ছাড়াও পঞ্চাশ থেকে আড়াই শো টাকা পর্যন্ত ডোনেশন হিসাবে আদায়ের ফলে প্রতি বছর লক্ষাধিক টাকা বাড়তি আদায় করা হয়েছে। সেই লক্ষ লক্ষ টাকা ফেরতের দাবি তোলা হয়। অবস্থান মঞ্চ থেকে নয় দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি নিয়ে প্রতিনিধি দল টিচার-ইনচার্জের কাছে ডেপুটেশন দেয়।

বীরভূম

বিডিও এবং থানায় বিক্ষোভ ডেপুটেশন

এস ইউ সি আই-এর মহম্মদ-বাজার লোকাল কমিটি এবং ইউ টি ইউ সি-এল এসের আহ্বানে খড়িমাটি খনি শ্রমিকদের ২০০২ সালের ন্যূনতম মজুরি চালু করা, পিএফ-এর সরকারি হিসাব প্রদান, মাপের কারচুপি বন্ধ করা, হাসপাতাল ও শিক্ষার বেসরকারীকরণ বন্ধ করা, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি রদ করা, পুনরায় বাসভাড়া বৃদ্ধি না করা, বাসে নিত্যযাত্রী ও ছাত্র কনসেশন চালু করা, যাত্রী পরিষেবার উন্নতি বিধান, কিলোমিটারের মাপে কারচুপি বন্ধ করা, এক্সপ্রেস লেবেল লাগিয়ে সাধারণ বাসে বেশি ভাড়া আদায় বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুনে সুসজ্জিত প্যাটেলনগর মিনারেলস ও মকদুমনগর খড়িমাটি খনি শ্রমিক সহ ৫ শতাধিক মানুষের বিক্ষোভ মিছিল ৭ ফেব্রুয়ারি আঙ্গার-গড়িয়া মোড় থেকে যাত্রা শুরু করে প্যাটেলনগর বিডিও অফিসের সামনে সমবেত হয়। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে দলের মহম্মদবাজার লোকাল সম্পাদক কমরেড কুদ্দুস আলির নেতৃত্বে পাঁচজনের প্রতিনিধি দল বিডিও'র কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। বিডিও দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেন।

শাসক সিপিএম দল এবং সিটু পরিত্যাগ করে বহু মানুষ এস ইউ সি আই এবং ইউ টি ইউ সি-এল এসে যোগদান করায় পঞ্চায়েত এবং শাসকদলের ক্রমাগত সন্ত্রাস এবং ভীতি প্রদর্শনের প্রতিকার এবং পুলিশ-প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা নেওয়ার দাবিতে থানায় বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

বিডিও অফিস এবং থানায় সমবেত জনতার সামনে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী ভাষণ দেন।

চা-বাগান মালিক নিহত

দায়ী কারা ?

সম্প্রতি আসামের গোলাঘাট জেলার গোবিন্দপুর চা-বাগানের সমস্যা জর্জরিত শ্রমিকদের বিক্ষোভের আকস্মিক বিস্ফোরণে বাগানমালিক রূপক গগৈ-এর মৃত্যু হয়েছে। বাগান মালিক যদি শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে দিনের পর দিন চরম উদাসীনতার পরিচয় না নিতেন তাহলে এই ধরনের ঘটনা হয়তো ঘটত না। এই শ্রমিকরা কেউই খুনি নয়, অতি দরিদ্র অসহায় শ্রমিক মাত্র। সমস্যার তীব্রতা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে। তাই ঘটনার পরপর তারা নিজেরাই থানায় গিয়ে পুলিশকে জানিয়েছে, ''মাসের পর মাস বেতন পাইনি, রেশন নেই, খাওয়ার কোন সংস্থান নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, আমাদের থাকার জায়গা নেই, থাকলেও আলো নেই। ফলে কারোর মাথা ঠিক ছিল না।'' ফলে বোঝাই যাচ্ছে বাগান মালিক শ্রমিকদেরকে খাটিয়ে শুধু মুনাফাই লুটে নিয়েছে, তাদের বাঁচিয়ে রাখার ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও দেয়নি। প্রচলিত আইন এই মৃত্যুর জন্য হয়তো শ্রমিকদেরই দায়ী করবে, তাদেরকে জেলে পুরবে, বিচারে হয়তো শাস্তিও দেবে; কিন্তু শ্রমিকদের মারমুখী করে তোলার জন্য যে মালিকী-শোষণ ব্যবস্থা ও তার পাহারাদার সরকার দায়ী বুর্জোয়া আইন তার দণ্ডবিধান করবে কি? যথার্থ ন্যায় বিচার তো মালিককে নির্দেশ দেবে শ্রমিকদের পাওনা গণ্ডা মেটাতে, তা সুনিশ্চিত করতে বলবে সরকারকে। যদি না মেটায়, প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা মালিকদের ও সরকারগুলিকে শাস্তি দেয় কি?

আজ এ সমস্যা শুধু আসামের চা-বাগানেই নয়। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতেও একই দুর্দশার চিত্র। ২০/২৫টি চা বাগান ডুয়ার্স এলাকায় বন্ধ। প্রায় ৩০/৩৫ লক্ষ মানুষের জীবন বিপন্ন। তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুর ব্যবস্থা না করে মালিকরা বাগান লকআউট করে দিয়েছে। অনাহারে অর্ধাহারে অপুষ্টিতে ধুঁকতে ধুঁকতে সহস্রাধিক শ্রমিক ইতিমধ্যেই মারা গেছে। এ সংকট শুধু চা শিল্পেই নয়। হুগলি নদীর দু'ধারে যে চটকলগুলি একসময় গড়ে উঠেছিল আজ তার অধিকাংশই বন্ধ। শিল্পাঞ্চল খাঁ খাঁ করছে। কর্মচ্যুত শ্রমিকরা উপায়ান্তর না পেয়ে কেউ কেউ সপরিবারে আত্মহত্যা করেছে। যারা বেঁচে আছে তাদেরকেও মনুষ্যেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা কী করবে? মিথ্যা আশ্বাসে তারা কি বঞ্চনাকে ভবিতব্য বলে মেনে নেবে? বুর্জোয়া দলগুলোর মত বামফ্রন্টের নেতামন্ত্রীরাও আজ বলছেন 'জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন চলবে না।' বলছেন, শিল্পে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক নাকি 'পার্টনারে'র মতো। কী অদ্ভুত এই 'পার্টনারশিপ'! কারখানা বন্ধ করে দেয় মালিক, শ্রমিকের মত নিয়ে করে না। শিল্প বা কারখানা বন্ধ হলে মালিকের স্বাভাবিক জীবনে ব্যাঘাত ঘটে না, তার পরিবার অনাহারে দিন কাটায় না, কিন্তু শ্রমিকদের ঘরে কান্নার রোল ওঠে, উপবাস শুরু হয়। যাঁরা বলছেন, শিল্প কারখানা চালু রাখার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের 'দায়' আছে তাঁরা বলুন, আসামের বা উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকরা কীভাবে সেই 'দায়' পালন করবে?

আসলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট এক চরম অবস্থায় পৌঁছেছে, তাই শ্রমিকদের উপর মালিকী আক্রমণও হয়েছে চরম। পাশাপাশি, কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলো — তাদের রঙ যাই হোক — আজ অত্যন্ত নগ্নভাবে মালিকদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় শ্রমিকদের বাঁচার পথ কী? সেটা কখনই ২/১টা মালিক বা ম্যানেজারকে হত্যা করা নয়। এই ধরনের কাজ শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করে না, বরং দিশাহীন নৈরাজ্যে নিক্ষেপ করে তাকে দুর্বল করে দেয়। বাঁচতে হলে আজ শ্রমিকদের সঠিক লাইনে সঠিক নেতৃত্ব খুঁজে নিয়ে সংগঠিত হয়ে দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনের ময়দানে নামতে হবে।

উত্তর দিনাজপুর

কিশোর অপরাধ বেড়ে চলায় উদ্বেগ

আন্দোলনে এমএসএস - ডিওয়াই ও

রায়গঞ্জ পুরসভার কান্তানগরে ৭ ফেব্রুয়ারি এক মানসিক প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণ করে দুই কিশোর। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ৮ ফেব্রুয়ারি এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস রায়গঞ্জ শাখার পক্ষ থেকে পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি করা হয় — জেলায় খুন, ধর্ষণ ও নারী পাচার রোধে পুলিশকে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮ ফেব্রুয়ারি এই দুটি সংগঠনের উদ্যোগে রায়গঞ্জ শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ডি ওয়াই ও'র উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড বিপ্লব কর্মকার ও এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা কমরেড শিপ্রা কর্মকার। শিপ্রা কর্মকার বলেন, মদ, জুয়া, অশ্লীল সিনেমা-পত্রপত্রিকার প্রভাব কিশোর যুবকদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার মানুষের নীতিনৈতিকতা মূল্যবোধ মেরে দিতে মাদকদ্রব্য, জুয়া ও অপসংস্কৃতির প্রসার ঘটাচ্ছে। এর কুফল হিসাবেই এ ধরনের কিশোর অপরাধের ঘটনা আমাদের দেশে ঘটছে। এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে আজ সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের, ছাত্র-যুবক-মহিলাদের ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নাহলে এই ধরনের ঘটনা আগামী দিনে বর্তমানের থেকেও মারাত্মক রূপ নেবে।

কলকাতা

এম এস এস-এর রাজনৈতিক ক্লাস

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে ১০ ফেব্রুয়ারি মহবোধি সোসাইটি হলে একটি রাজনৈতিক ক্লাস হয়। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের 'নারী মুক্তি প্রসঙ্গে' বইটি ও নারীজীবনের নানা সমস্যার উপর প্রশ্নের ভিত্তিতে ক্লাসটি পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী। ৮৪ জন মহিলা এতে অংশ নেন। ক্লাসের শেষে ১ ডিসেম্বর '০৪ মহিলাদের দিল্লী অভিযানের উপর তথ্যচিত্রটি দেখানো হয়।

নেপালের জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার চাই

একের পাতার পর

পাশাপাশি মুষ্টিমেয় শহরবাসী নেপালি ধনী সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হয়েছে। নেপালের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নেপালের বণিকসভা (চেম্বার অব কমার্স) তৈরি হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে, বিশ্বপুঁজিবাদের তৃতীয় তীব্র বাজার সংকটের যুগে স্বাভাবিকভাবেই নেপালি পুঁজিবাদ পঙ্গু হয়ে থেকেছে। অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে ভারতবর্ষের পুঁজির প্রভাব বেড়েছে, ভারতীয় আইটিসি ও হিন্দুস্থান লিভারের (বৃটিশ ইউনিলিভার যার মূল কোম্পানি) মত বহুজাতিক কোম্পানিগুলি সস্তা শ্রমের সুবিধা নিতে নেপালে কারখানা করেছে। ভারতীয় পণ্যে নেপালের বাজার ছেয়ে গিয়েছে।

নেপালের বুর্জোয়া রাজনীতির বিকাশ হয়েছে বিচিত্রভাবে। একদিকে রাজাকে সামনে রেখে বুর্জোয়া আমলাতন্ত্র নেপালি জনগণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার, এমনকী ভোট দিয়ে একটা বুর্জোয়া সরকার গঠনের অধিকারও স্থায়ীভাবে দেয়নি। ১৯৫০ সালে রানাশাহী-বিরোধী প্রবল আন্দোলনকে সামলাতে সদ্যস্বাধীন ভারতের বুর্জোয়া শাসকেরা বর্তমান রাজা জ্ঞানেন্দ্রর ঠাকুরদা ত্রিভুবন নারায়ণকে পাঠান এবং তাঁকে সামনে রেখে নেপাল কংগ্রেস দল নির্বাচিত সরকার গঠন করে। পরবর্তীতে গণআন্দোলনের চাপে রাজাশাসিত বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্র নির্বাচনের দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে। আবার সেই সরকারকে ফেলে দিয়ে মনোনীত সরকার বসিয়েছে, জরুরি অবস্থা জারি করেছে। কাজেই, রাজা জ্ঞানেন্দ্র ১লা ফেব্রুয়ারি নেপালে গণতন্ত্র হরণ করেছেন, তার আগে একটা প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ছিল — তা নয়। কাজেই মনোনীত দেউবা সরকারের মতো একটা সরকার বসিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন বা ভারতীয় শাসকদের সন্তুষ্ট করলেই নেপালে গণতন্ত্র ফিরে এসেছে বলা যাবে না।

স্বাধীনতার পর পঞ্চান্ন বছরে নেপালে যে মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায় এবং বুর্জোয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়েছে, রাজনীতিতেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী চাপকে লঘু করে দরকষাকষি করার জন্য নেপালি বুর্জোয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা চীন ঘেঁষা ভাব দেখিয়েছে, বাফার রাষ্ট্র হিসাবে ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে নেপালি শাসকরা নেপালি ধনিকশ্রেণীর জন্য সুযোগসুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেছে। এই টানাপোড়েনে সুবিধামতো তারা নেপালি জনগণের দেশপ্রেমকে কাজে লাগিয়েছে। জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে যখন রাজাশাসিত স্বৈরতন্ত্র দমন করেছে, তখন বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতের শাসকগোষ্ঠী, নেপালি জনগণের প্রতি ভারতীয় জনগণের সহমর্মিতাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে, রাজার পাশে দাঁড়িয়েছে। এমনকী এই জ্ঞানেন্দ্রকেও ভারতের শাসকগোষ্ঠী অস্ত্র ও সামরিক পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান গণবিক্ষোভকে ঠেকানো জ্ঞানেন্দ্রর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ক্রমাগত শোষণ-বঞ্চনা ও সেনা-অত্যাচারে জর্জরিত নেপালি জনগণের মনে রাজার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এমনভাবে পুঞ্জীভূত হয় যে, রাজার প্রতি তাদের আস্থার মোহ এখন আর নেই বললেই চলে। রাজার স্বৈরাচারের অবসান ঘটিয়ে গণপরিষদ গঠন করে সংবিধান প্রণয়ন ও নির্বাচিত সরকার গঠনের দাবি ধীরে ধীরে সর্বসম্মত দাবি হিসাবে গণআন্দোলনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে। এই দাবিতে রাজকীয় স্বৈরাচারের বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হওয়ায়, আতঙ্কিত রাজা জ্ঞানেন্দ্র ১লা ফেব্রুয়ারি জরুরি অবস্থা জারি করে জনগণের প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করে।

গণআন্দোলন দমনে রাজার ব্যর্থতা এবং জনগণের বিক্ষোভ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার পরই এখন ইঙ্গ-মার্কিন ও ভারতীয় শাসকরা নেপালি জনগণকে ঠকাতে গণতন্ত্রের পূজারির ভেক ধরেছে। কিন্তু রাজাকে সাহায্য দেওয়াও তারা বন্ধ করেনি। তাদের লক্ষ্য নেপালে নিজ নিজ দেশের পুঁজির স্বার্থরক্ষা। নেপালের বর্তমান সঙ্কটে তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালেরও প্রকৃত চেহারা বেরিয়ে এসেছে। নেপাল ঘুরে এসে অ্যামনেস্টি বলেছে, নেপালে গণতন্ত্র-হত্যা জ্ঞানেন্দ্রর হাতে হয়নি, ১লা ফেব্রুয়ারি জরুরি অবস্থা জারির আগেই সরকার ঘোষিত ''মাওবাদী জঙ্গি''রা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। একথার দ্বারা তারা স্পষ্ট করে দিয়েছে, আক্রান্ত জনগণের বাঁচার জন্য যে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা, তাদের চোখে তা জনগণের উপর শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণের মতোই সমান অপরাধ।

নেপালের জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা চাই। রাজাকেন্দ্রিক কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারের অবসান আমরা চাই। আমরা চাই বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত নেপালি জনগণের নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের নিরঙ্কুশ অধিকার। নেপালের জনগণের আন্দোলন, দুনিয়াব্যাপী শোষিত জনগণের মুক্তি সংগ্রামেরই অংশ, তাই এ আন্দোলন আমাদের আন্দোলন। নেপাল ও ভারতের জনগণের মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক।

নেপালে স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদে কলকাতায় এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ মিছিল ● কনসুলেটে স্মারকলিপি

নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্র কর্তৃক দেউবা সরকারকে বরখাস্ত করা, জনগণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু হরণ করে জরুরি অবস্থা জারি করা, সামরিক শাসন নামিয়ে আনা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করার প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি কলকাতায় নেপালি কনসুলেট জেনারেলের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং রাজার উদ্দেশে স্মারকলিপি প্রদান করে। নেপালের রাজার স্বৈরাচারী শাসন প্রত্যাহারের দাবিতে ভারতের সকল রাজ্যেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছে এস ইউ সি আই।

নেপালের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বিষহ। দেশীয় পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীরা এখানকার সস্তা শ্রমশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুটে নিয়েছে। নেপালের জনগণের সংগ্রামকে রাজা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের অস্ত্র সাহায্যে বলীয়ান সেনাবাহিনী দ্বারা নির্মমভাবে দমন করছে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে হাজার হাজার মানুষ শহীদের মৃত্যুবরণ করছে। এই সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানিয়ে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের নেতৃত্বে এক সুসজ্জিত মিছিল এদিন খিদিরপুর মোড় থেকে নেপালি কনসুলেট জেনারেলের দপ্তরের সামনে গেলে বিশাল পুলিশবাহিনী মিছিলের গতিরোধ করে। সেখানেই বিক্ষোভ সভা হয় এবং রাজা জ্ঞানেন্দ্রর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। এরপর কমরেড মানিক মুখার্জীর নেতৃত্বে কমরেডস্ সুনীল মুখার্জী, শংকর সাহা, তপন রায়চৌধুরী এবং নেপালি জনঅধিকার সুরক্ষা সমিতি (ভারত)-এর নেতা কমরেড ঈশ্বরী ভাণ্ডারী এবং এ বি থাপাকে নিয়ে এক প্রতিনিধিদল কনসুলেট জেনারেলের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করেন। কনসুলেট জেনারেল রাজার হাতে তা পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষে বিক্ষোভ সমাবেশে ভাষণ দেন কমরেডস্ শংকর সাহা এবং এ বি থাপা। কমরেড থাপা তাঁর ভাষণে নেপালে আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ এবং ভারতের আধিপত্যবাদের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, রক্ত দিয়েই নেপালি জনগণকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মুষ্টিমেয় মানুষের সমর্থন নিয়ে চলা রাজার শাসন আর চলবে না। আমেরিকা, ভারত, ব্রিটেনের শাসকদের মুখে গণতন্ত্রের কথা ধাপ্পা ছাড়া কিছু নয়। নেপালের জনগণের সংগ্রামের সমর্থনে ভারতের বুকে এস ইউ সি আই যেভাবে এগিয়ে এসেছে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলও যদি তেমন ভূমিকা নেয়, তবে নেপালের আন্দোলন শক্তিশালী হবে।

১৬ ফেব্রুয়ারি নেপালে স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদে কলকাতায় নেপালি কনসুলেটের সামনে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

পুরুলিয়ায় দুষ্কৃতীদের আক্রমণে

কমরেড নারায়ণ কুইরি নিহত

পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডি থানার সেরেঙি অঞ্চলের প্রবীণ এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড নারায়ণ কুইরি তাঁর নিজের গ্রাম শশ-তে গত ২০ জানুয়ারি সকালে দুষ্কৃতীদের দ্বারা টাঙির আঘাতে নিহত হয়েছেন। এই এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই ফরওয়ার্ড ব্লক দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা তাদের দলের রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এস ইউ সি আই-এর সাথে যুক্ত হচ্ছিলেন। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়েই ফরওয়ার্ড ব্লক আশ্রিত সমাজবিরোধী জয়সেন পাণ্ডে (এলাকায় 'ঠাকুর' নামে পরিচিত) এ'দিন সকালে কমরেড নারায়ণ কুইরিকে টাঙি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। ১৯৬০ সাল থেকে এস ইউ সি আই-এর সাথে যুক্ত প্রবীণ এই কর্মীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে এলাকায় প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বাঘমুন্ডি থানায় বিক্ষোভ হয়।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

মেদিনীপুর জেলার এস ইউ সি আই মেছেদা লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড প্রভাকর সামন্ত গত ৯ ফেব্রুয়ারি ভোর পাঁচটায় কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। দুরারোগ্য ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে কিডনি বিপর্যয়ের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯৭৫ সালে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন। শান্তিপুর ও খারুই অঞ্চলে দলের সাংগঠনিক বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট গড়ে ওঠার ফলে জমি ও বাস্তুচ্যুত মানুষদের চাকরির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন কমরেড সামন্ত। তিনি দীর্ঘ ১৪ বছর উদ্বাস্তু কলোনি কমিটির সম্পাদক ছিলেন। থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্টের কনস্ট্রাকশন শ্রমিকদের মজুরি ও অন্যান্য দাবিতে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং এই শ্রমিকদের নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠন করেন। তিনি ছিলেন এই ইউনিয়নের সম্পাদক। তিনি পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে দলের মেছেদা লোকাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এলাকায় বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। এলাকায় একটি মাধ্যমিক স্কুল গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা নেন। তিনি ছিলেন এই স্কুল পরিচালন কমিটির সম্পাদক।

৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা থেকে তাঁর মরদেহ এলাকায় এলে দলের কর্মী-সমর্থকরা সহ স্থানীয় শত শত মানুষ চোখের জলে প্রয়াত কমরেডকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড প্রভাকর সামন্ত
লাল সেলাম

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

গণদাবী

২৫ ফেব্রুয়ারি - ৩ মার্চ ২০০৫

৫৭ বর্ষ / ২৫ সংখ্যা

ফ্রান্সে ছাত্রআন্দোলন

ফি বৃদ্ধি, শিক্ষক সংখ্যা হ্রাস ও পরীক্ষাপদ্ধতি বদল করার নামে দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাজগৎ থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ফ্রান্সের সরকার ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি বিল পার্লামেন্টে পেশ করেছিল। এর প্রতিবাদে এ'দিন প্রায় ৫০ হাজার স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী রাজধানী প্যারিসের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশের সাথে ছাত্রদের খণ্ডযুদ্ধও হয়। পরে শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে, প্রস্তাবিত আইন সরকার সংশোধন করবে।

এ'বছর তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষা দিল

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্ষদের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে জানান হয়েছে,

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ-এর চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি পরীক্ষা ১৯ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। মাতৃভাষা-সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস-ভূগোল, বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। সারা রাজ্যের ২৮০৪টি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রায় সওয়া তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রী এবার পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

সরকারি তরফে বিভিন্নভাবে এই পরীক্ষায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। গত বছরের সার্কুলার নিয়ে এবার স্কুলে স্কুলে হুমকি দেওয়া হয়েছে যাতে কেউ এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে। পরীক্ষা কেন্দ্র দেওয়ার ব্যাপারেও প্রচুর বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে।

সবচেয়ে ন্যক্কারজনক কাণ্ড ঘটেছে বীরভূম জেলায়। ঐ জেলায় সংসদ চেয়ারম্যানের মদতে সাত্তোর পঞ্চায়েত প্রধান দলবল নিয়ে হামলা চালিয়ে কেন্দ্র ডাঙ্গাল পাটি বেসিক স্কুলের পরীক্ষা ভণ্ডুলের চেষ্টা করে। কিন্তু অভিভাবক, শিক্ষক ও স্থানীয় মানুষজনের প্রতিরোধে তা ব্যর্থ হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ২/১টি পরীক্ষা কেন্দ্রেও অনুরূপ চেষ্টা হয়েছিল — কিন্তু তা সফল হয়নি। সরকারি বাধাদান উপেক্ষা করে এবার ১৮ হাজার পরীক্ষার্থী বেড়েছে এবং পরীক্ষা কেন্দ্র বেড়েছে ১৮৮টি। দলমত নির্বিশেষে মানুষ এই পরীক্ষাকে সমর্থন জানাচ্ছেন। এই পরীক্ষা সরকারি ভ্রান্ত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে শিক্ষার মানোন্নয়নের সহায়ক হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছে।

সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে মার্কশীট দেওয়া হবে। উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এছাড়া মে মাসে অনুষ্ঠান করে বিশেষ কৃতী ৫০০ জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

প্রায় ৩৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। প্রায় ৪৫ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ এই পরীক্ষার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে একে সফল করার কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেছেন। সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে এভাবে কাজ করার দৃষ্টান্ত নজিরবিহীন। ১৪ বছর ধরে নিরলসভাবে শিক্ষক শিক্ষানুরাগী মানুষজন যেভাবে সহযোগিতা করছেন তা সত্যিই অতুলনীয়।

১৯৯২ সালে এই পরীক্ষার সূচনা হয়েছিল। সে বছর ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল — যা বর্তমানে প্রায় ১৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে সরকারের বিন্দুমাত্র সততা থাকলে অবিলম্বে তারা বৃত্তি পরীক্ষা চালু করবে। সেই সঙ্গে প্রথম শ্রেণী থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু করার দাবিও আমরা জানাচ্ছি। সাথে সাথে উপযুক্ত মানের ইংরেজি বই সরবরাহ করার দাবিও আমরা রাখছি।

পর্ষদের পক্ষ থেকে সভাপতি অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখার্জী, সম্পাদক কার্তিক সাহা, সহসভাপতি অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে প্রমুখ কলকাতা ও আশপাশের জেলার বহু পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন।

পরীক্ষাকেন্দ্রে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলছেন পর্ষদ সভাপতি অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, তাঁর পাশে রয়েছেন অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে, কার্তিক সাহা।

মহামিছিলের দাবিগুলি নিয়ে রাজ্যপালের সাথে আলোচনা

এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে গত ২৮ জানুয়ারি ১৯ দফা দাবির ভিত্তিতে মহামিছিলি, আকস্মিক প্রবল বৃষ্টির মধ্যে দেশবন্ধু পার্ক থেকে ধর্মতলায় রানি রাসমণি রোডে যায়। ২ কোটি মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত রাজ্যপালের উদ্দেশে রচিত স্মারকলিপিগুলি এক প্রতিনিধিদল রাজভবনে গিয়ে জমা দিয়ে আসেন। এরই ভিত্তিতে রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর আমন্ত্রণে ২১ ফেব্রুয়ারি, সোমবার দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডুর নেতৃত্বে রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার (এম এল এ), কমরেড সাধনা চৌধুরী, কমরেড সদানন্দ বাগল ও কমরেড তপন রায়চৌধুরী এই পাঁচজনের এক প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের সাথে দেখা করেন এবং দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০০৩, স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারীকরণ, চা-বাগান শ্রমিকদের দুরবস্থা, চটকল শ্রমিকদের সমস্যা, ক্রমাগত রান্নার গ্যাস এবং কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা না করে নানা অজুহাতে বার বার পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধি প্রভৃতি জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত ১৯ দফা দাবি নিয়ে প্রতিনিধিরা মাননীয় রাজ্যপালের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী বলেন যে, তিনি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে দেখবেন এবং অনুসন্ধান করে সমাধানের চেষ্টা করবেন।

২১ ফেব্রুয়ারি রাজভবনে রাজ্যপালের সাথে আলোচনা করতে যাচ্ছেন (বাদিক থেকে) কমরেডস্ সাধনা চৌধুরী, দেবপ্রসাদ সরকার, সদানন্দ বাগল, গোপাল কুণ্ডু এবং তপন রায়চৌধুরী।

* জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল,
* গরিব-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ক্ষুদ্রশিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ,
* কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ,
* কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুতের দাবিতে

অল বেঙ্গল
ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে

২২ মার্চ, ২০০৫

পার্লামেন্ট অভিযান সফল করুন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net